ভে ত রে

ঘৃণার বচন বিজেপির মতাদর্শ ও রাজনীতিরই ২
'ঘর ওয়াপসি'র অভিযান সাম্প্রদায়িক ... অপরাধ ... ৩
... গণ আন্দোলন তীব্রতর করুন ... ৪
চটশিল্প কী গভীর খাদের কিনারে? ... ৫
আজকের বিহার ৬
পরিস্থিতির দাবি ঃ কাজের ধারাকে উন্নত করুন ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৪১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালো দিবসে দেশজুড়ে প্রতিবাদ

৬ ডিসেম্বর ভারতে এক কালো দিন হিসেবেই পরিচিত। আজ থেকে ২২ বছর আগে এই দিনটিতে সংঘ পরিবারের সংগঠনগুলো আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, বিজেপি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার আক্রমণ চালিয়ে বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ঐ আক্রমণ একই সাথে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ও অস্তিত্বকেই ধ্বংস করতে আগ্রাসী হওয়ার বার্তা দিয়েছিল। গত ২২ বছর ধরে দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে গড়নটুকু রয়েছে তার ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালানো হয়েছে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারিরা আজও সাজা তো পায়ই নি, পরন্তু তারা এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরে ভালোরকম গেঁড়ে বসেছে। নির্বাচনের কথা ভেবে দিল্লী এবং অন্যান্য রাজ্যে দেখাও গেল কীভাবে সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছিল, কোন মাত্রায় দাঙ্গার পরিবেশ তৈরী করা হয়েছিল। আরও অনেক ঘটনা ও কারণ রয়েছে। ফলে ৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা ভালোমাত্রাতেই রয়েছে। তাই ২০১৪-এর ৬ ডিসেম্বর দেশজুড়েই ধ্বনিত হল সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও হিংসার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ন্যায় ও ঐক্যের দাবিতে এবং সমাজের পুনর্নির্মাণের জন্য সোচ্চার গণপ্রতিবাদ। দাবি ওঠে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারিদের শাস্তি চাই, জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, এক আধুনিক ও সভ্য ভারত নির্মাণ এবং রাষ্ট্র-সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হিংসাকে প্রতিহত করতে আইন প্রণয়ন ও সমন্বয়ের জন্য আমূল রাজনৈতিক সংস্কার চাই।

কলকাতায় ৬ ডিসেম্বর ১৭টি বামদলের যুক্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের বিশাল নজরকাড়া মিছিল সংগঠিত হয়েছে।

দেশের রাজধানী দিল্লীতে বিভিন্ন বামপন্থী দল, প্রগতিশীল সংগঠন, নারী সংগঠন, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আরও বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একসাথে প্রতিবাদে পথে নামেন। তাঁরা মাণ্ডি হাউস থেকে যন্তর মন্তর পর্যন্ত মিছিল করেন। অংশগ্রহণ করে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি, এ আই এস এ, জওহরলাল নেহরু ছাত্রসংসদ, এ আই সি সি টি ইউ। সামিল হয় লোক রাজ সংগঠন, সিটিজেন্স ফর ডেমোক্রেসী, ডি এস এফ, লেফ্‌ট কালেকটিভ, এস ইউ সি আই (সি), কমিউনিস্ট গদর পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, সোস্যালিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম মজলিশ ঈ মুশাওয়ারত, ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টিক পিপলস ফ্রন্ট, পুরোগামী মহিলা সংগঠন, হিন্দ্ নওজোয়ান একতা সভা, মজদুর একতা কমিটি, পিপলস মুভমেন্ট এগেইন্সট ইউ এ পি এ ইত্যাদি সংগঠন সমূহ। মিছিল যন্তর মন্তরে এসে তা এক বিশাল সমাবেশের চেহারা নেয়। তারপর চলে এক সংক্ষিপ্ত সভা। সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরো সদস্য কবিতা কৃষ্ণাণ নির্দিষ্টভাবে বলেন, বিজেপি-আর এস এস প্রতিনিধি সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি সম্প্রতি যে 'রামাজাদা' ও 'হারামজাদা' মন্তব্য করেন তা নিছক কোন বিকৃতি মাত্র নয়, এটা আর এস এস-এর জন্মাবধি মতবাদের প্রতিফলন। সাধ্বীর মন্তব্যকে এক পশ্চাদপদ পটভূমি থেকে আসা এক গ্রামীণ মহিলার 'অনভিজ্ঞ' প্রতিক্রিয়া বলে চরিত্রায়িত করার মোদীর যে অপচেষ্টা, তাকে তুলোধোনা করে কবিতা বলেন, এই ধরণের সাফাই দেশের গরিব শ্রমজীবী নারীদের প্রতি অপমানজনক। সাধ্বীর মন্তব্যের সাথে তাঁর গ্রামীণ বা জাতপাতগত প্রেক্ষাপটের কোন যোগ নেই, তিনি যা বলেছেন সেটা আর এস এস-এর মতবাদের প্রতি আনুগত্য অনুযায়ীই। এ আই এস এ-র নেতা শ্বেতা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, মোদী সরকার যে ফের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছে সেটা বস্তুত সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে বিকৃত ও বিভেদমূলক, আমাদের দেশের সমগ্র যে ইতিহাস রয়েছে তার বিরোধী।

লক্ষ্ণৌতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সি পি আই, সি পি আই (এম), এস ইউ সি আই (সি), ফরওয়ার্ড ব্লক উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা অভিমুখে এক যুক্ত প্রতিবাদী অভিযান সংগঠিত করে। জোরদার দাবি তোলা হয় বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারিদের বিচার চাই শাস্তি চাই! সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানো বন্ধ কর! সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের কুশপুতুল পোড়ানোর সাথে সাথে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতিকে তার অসাংবিধানিক ঘৃণ্য বক্তৃতাবাজীর কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণ করতে হবে!

কলকাতায় ছয় বামপন্থী দলের যুক্ত বিক্ষোভ সভা

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম), সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি আই (সি) ছয়টি দলের গৃহীত ৯ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতায় বিগত ১১ ডিসেম্বর মোদী সরকারের আনীত বীমা শিল্পে বেসরকারীকরণ, প্রতিরক্ষা শিল্প বিদেশী পুঁজির হাতে ছেড়ে দেওয়া, শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার খর্বিত করা, জমি সিলিং আইন বাতিলের বিরুদ্ধে এবং বিজেপির দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তুলে রাজনীতির ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে কলকাতায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়ে ছয়টি বামপন্থী দলের আহ্বানে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী থাকলেও রাণী রাসমনি রোডের মুখে পুলিশ মিছিলের গতিরুদ্ধ করে। দীর্ঘক্ষণ মিছিল দাঁড়িয়ে থাকা ও সভা শুরু করতে না পারার কারণে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের স্বাভাবিক কারণেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং পুলিশের তৈরী ব্যারিকেড ভেঙে দেওয়া হয়। তীব্র অসন্তোষের মধ্যে বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় কমরেডরা পরিস্থিতি সামাল দিলে বিক্ষোভ সভা শুরু হয়।

সভার শুরুতে ছয়টি দলের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সি পি আই (এম)-এর বিমান বসু বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আর এস পি-র ক্ষিতি গোস্বামী, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, সি পি আই-এর দেবাশীষ দত্ত, সি পি আই (এম)-এর সূর্যকান্ত মিশ্র এবং এস ইউ সি আই (সি)-র অমিতাভ মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে একদিকে মোদী কর্তৃক ভারতবর্ষকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার আগামী ২৬ জানুয়ারি ভারত সফরের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় তীব্র গণআন্দোলন ও প্রতিরোধের ডাক দেন। পাশাপাশি পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কথাও তুলে ধরেন।

১৮ ডিসেম্বর ঃ কমরেড বিনোদ মিশ্রের ষোড়শ প্রয়াণ বার্ষিকী ও সংকল্প দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ

শ্রমিকদের ৫ ডিসেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস

৫ ডিসেম্বর দেশের ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস সংগঠিত হয়। শ্রম আইনে শ্রমিক-বিরোধী সংশোধনী, বীমাক্ষেত্র সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ইউনিটগুলোতে আবার বিলগ্নীকরণ; প্রতিরক্ষা, বীমা, রেলওয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদন করা এবং অন্যান্য শ্রমিক বিরোধী, কর্পোরেটমুখী যা সব পন্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে, এসবের বিরুদ্ধেই ছিল ৫ ডিসেম্বরের প্রতিবাদী কর্মসূচী। এই আহ্বান দিয়েছিল এ আই সি সি টি ইউ, বি এম এস, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, সিটু, এ আই ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এস ই ডব্লিউ এ, ইউ টি ইউ সি, এল পি এফ এবং ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রতিরক্ষা, টেলিকমিউনিকেশন ও অন্যান্য শিল্প-পরিষেবা ক্ষেত্রের স্বাধীন কর্মচারি ফেডারেশন ও সমিতি। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার ছয়মাসের মাথায় এটাই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় স্তরে প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। এতে অংশগ্রহণ করেন দেশজুড়ে হাজার হাজার শ্রমিক। প্রতিবাদ সংগঠিত হয় দেশের রাজধানী দিল্লী সহ সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতে। অনেক রাজ্যে জেলা সদরেও বিক্ষোভ অবস্থান চলে। এই যুক্ত প্রতিবাদে এ আই সি সি টি ইউ সর্বত্রই সক্রিয় উদ্যোগ নেয়। পুদুচেরীতেও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো যুক্ত প্রতিবাদ সংগঠিত করে। এ আই সি সি টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, সিটু, আই এন টি ইউ সি, বি এম এস, এ টি পি, এম এল এফ এবং বি এস এন এল ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নেয়।

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

"আজকের দেশব্রতী" গ্রাহক হোন

সম্পাদকীয়

শিশু কবরের কান্না আর শুনতে চাই না

২০১৪-র বোধহয় সবচেয়ে পৈশাচিক নারকীয় শিশুহত্যা সংগঠিত হল প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের বুকে। নিহতের সংখ্যা দেড় শতাধিক, আহতের সংখ্যা সওয়া শতাধিক। হতাহতদের পঁচানব্বই শতাংশই শিশুরা। প্রাচীর পরিবেষ্টিত এক আর্মি পাবলিক স্কুলে সংগঠিত গণহত্যার বর্বরতা কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেদিন সংগঠিত করেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি, এবার পাকিস্তানের মাটিতে যা সংগঠিত করল তালিবানী মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী শক্তি। যারা এটা করল তারা সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু, শৈশবের শত্রু। একে ধিক্কার জানানোর কোন ভাষা হয় না। পেশোয়ারের ঐ বদ্ধভূমি থেকে এই সুদূর পশ্চিমবঙ্গেও চোখের সামনে ভেসে উঠছে শিশুনরমেধযজ্ঞের বীভৎস ছবি। যারা এই ক্ষমাহীন অপরাধ সংগঠিত করল সেই টি টি পি তথা 'তেহরিক ই তালিবান অব পাকিস্তান' সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এতটুকু অনুতপ্ত নয়, বরং তৃপ্ত বলে দাবি করেছে এটা জানিয়ে যে তাদের এই অপারেশান পাক সেনাবাহিনীর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ''জর্জ-এ-আজব'' অর্থাৎ নিকেশ অভিযান চালানোর পাল্টা বদলা। টি টি পি-র জনৈক মুখপাত্রের মতে, পাক ও মার্কিন রাষ্ট্রশক্তিকে খুশী করতে পাক সেনা অফিসাররা উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালিবানী সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূলীকরণের যুদ্ধাভিযান চালাচ্ছে, আর তালিবানী খাতায় নাম লেখানো বা সমর্থকদের পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে গণহত্যা করে চলেছে, এমনকি শিশুদেরও হত্যা করছে। এর মাশুল কত মর্মান্তিক হতে পারে তা পাক সেনা অফিসারদের বুঝিয়ে দিতেই পাল্টা শিশু গণহত্যার পলিসি নেওয়া হয়েছে দাবি করেছে তালিবানী গোষ্ঠীটি। পেশোয়ারের পাশবিকতার রাজনৈতিক-সামরিক পোস্টমর্টেম করলে যেটা বেরিয়ে আসছে তা হল, অপরাধ সংশ্লিষ্ট তালিবানীরাই শুধু করছে তা নয়, অপরাধ করে চলেছে পাক ও মার্কিন রাষ্ট্রশক্তিও। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশ করা এক পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাক-আফগান সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী নিকেশ অভিযানে মার্কিন-পাক আঁতাতে বোমারু ড্রোন হানায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ব্যাপক, কিন্তু তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। এই তথ্যে প্রমাণ হয়, তালিবানী সন্ত্রাসবাদের পক্ষে থাকা লোকসংখ্যা এমন কিছু বেশী নয়, সুতরাং সেটাকে ছুতো করে প্রধানত মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির ঐ পাক-আফগান সীমান্তে ড্রোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ফ্রন্ট খোলার যুক্তি দাঁড়ায় না। পাক রাষ্ট্রশক্তি ও সেনাবাহিনীরও মার্কিনের ঐ আঞ্চলিক সামরিক রণনীতিকে সঙ্গ দেওয়ার সাফাই ধোপে টেঁকে না। আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ইসলামিক জেহাদী বোমারু অভিযানে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার পাল্টা মডেলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে সরাসরি বিমানহানা চালিয়ে ওসামা বিন লাদেন হত্যা সাঙ্গ করা এবং তালিবানী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে স্কুলবাসের মেয়েদের হত্যা ও বিশেষত মালালা ইউসুফজাই ইস্যুর উপলক্ষ পেয়ে যাওয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রশক্তি তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামরিক-রণনৈতিক অনুপ্রবেশের চাপ বাড়িয়ে দেয়। আর সেই চাপের সামনে পাক রাষ্ট্রশক্তিও অধীনতার আঁতাতে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এর যোগফলেই সিন্ধু সভ্যতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশটি মার্কিনের সামরিক অভিযান, পাক সেনার সন্ত্রাস এবং পক্ষান্তরে তালিবানী সন্ত্রাসে রক্তাক্ত, হতাহত, জর্জরিত হয়ে চলেছে। অপারেশান চালানো দুই পক্ষ বাহানার আঙ্গুল তুলছে পরস্পরের বিরুদ্ধে, আর তার নিশানা হচ্ছে নিরীহ জনগণ, নিস্পাপ শিশুরা।

এই প্রকৃত নির্মমতাকে আড়ালে রেখে যেমন মায়াকান্না শোনাচ্ছেন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ, তেমনি ঐ প্রসঙ্গ চেপে রেখে কুম্ভীরাশ্রু ফেলছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান ওবামা বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনও 'সজল নয়নে' আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধাভিযানের বিশ্বরণনীতি রণক্লান্ত হবে না, বরং আরও জোরদার হবে, আর প্রত্যাঘাত হানায় পাক রাষ্ট্রশক্তির পাশে থাকবে মার্কিন-ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট একথাও বলেছে যে, ২০১৪ সালটা বিশ্বের শিশুদের জন্য খুব খারাপ গেল। মূলত আফ্রিকা থেকে পশ্চিম এশিয়ায় লাগাতার সন্ত্রাসবাদী হানায় শিশুহত্যার ভিত্তিতেই ঐ মূল্যায়ন। এবার সেই তালিকায় নয়া সংযোজন ধরা হবে নিশ্চয়ই পাকিস্তানের শিশুহত্যাকে। একইসময়ে খবর হল, ইয়েমেনে আত্মঘাতী গাড়িবোমায় ১৫টি শিশুর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এই শিশুঘাতী বিশ্বের ছবি কি কেবলই ২০১৪-র? না। এটা চলেই আসছে। নাৎসী ক্যাম্প থেকে মাই লাই ...।

ভারতীয় প্রভাবশালী মিডিয়া আজ দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিধ্বংসী যত অস্তিত্ব দেখাচ্ছে কেবল ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের মধ্যেই। এভাবে আড়াল করতে চায় মার্কিন-ইজরায়েল অক্ষশক্তির প্যালেস্তাইনের বুকে গত ছয় দশক ধরে চালিয়ে আসা আগ্রাসন, যুদ্ধাভিযান, সন্ত্রাসবাদকে; যার বলি হয়েছে অসংখ্য প্যালেস্তানীয় জনতা, লক্ষ লক্ষ শিশুকে যেখানে হতাহত-বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। ইরাক সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে যুদ্ধবাজ মার্কিনের বারেবারে হানা আর অনুপ্রবেশে শেষ হয়ে গেছে অগুন্তি জীবন, আর কত শিশুর প্রাণ। আর, ভারতের মোদীবাহিনীর সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের মিশেল প্রবণতাও যে গণহত্যা ও ব্যাপক শিশুহত্যায় কত বর্বর হতে পারে তার নজীর রয়েছে ২০০২-এর গুজরাট সংখ্যালঘু নিধন থেকে ২০১৪-তে উত্তরপ্রদেশে মুজফফরনগরকে মুসলিমদের মৃত্যু উপত্যকা বানানোর মধ্যে। সুতরাং সন্ত্রাসবাদের কোনও মডেলেরই নিজেদের হাত ধূয়ে ফেলার উপায় নেই। এই সমস্ত অপরাধ দোষী সাব্যস্ত হয়ে চলেছে দেশ-কাল নির্বিশেষে জনগণের হৃদয় যন্ত্রণার মধ্যে। অতএব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরোধিতায় চেতনার চাবিকাঠিটি উপলব্ধি করতে হবে সঠিকভাবে। এই সন্ত্রাসবাদের বিকল্প কখনই ঐ সন্ত্রাসবাদ হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার একমাত্র কার্যকরি বিকল্প যা হওয়া উচিত তা হল গণতন্ত্র, সম্প্রীতি ও মানবতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে গণঅভিযানে সামিল হওয়া।

বনগাঁ শহরে যুক্ত বামসভা

গত ১৩ ডিসেম্বর ৬টি বামপন্থী দলের আহ্বানে ৯টি দাবি নিয়ে সি পি আই (এম), সি পি আই, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, এস ইউ সি আই (সি) এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বেলা ২টা থেকে অবস্থান কর্মসূচী হয়। শতাধিক মানুষ অবস্থানে ছিলেন বনগাঁ শহরে যশোহর রোডের পাশে ক্যালট্যাক্সের সন্নিকটে বহু মানুষ সমবেত হয়ে বক্তব্য শোনেন। বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণ প্রামাণিক (সি পি আই (এম এল) লিবারেশন), রণজিৎ কর্মকার (সি পি আই), পঙ্কজ ঘোষ (সি পি আই (এম), স্বপন মণ্ডল (এস ইউ সি আই (সি), মৃণাল সিকদার (ফরওয়ার্ড ব্লক)। সভাপতিত্বে ছিলেন দুলাল মণ্ডল। গণসঙ্গীত পরিবেশন করে শোনান শ্বেতা চক্রবর্তী।

ঘৃণার বচন বিজেপির মতাদর্শ ও রাজনীতিরই পরিচায়ক নিরঞ্জন জ্যোতির সামাজিক পৃষ্ঠভূমির নয়

দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে গিয়ে মোদী সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভোটারদের কাছে আহ্বান জানালেন—হয় 'রামজাদে'-দের (রামের সন্তান) আর না হয় 'হারামজাদে'-দের (বেজন্মা) সরকারকে বেছে নিন। এটা শুধু একটা গালাগালিভরা শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্তই নয়। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি ক্যামেরার সামনে এর অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ''মুসলিম ও খ্রিষ্টানরাও রামের সন্তান---- আর তারা যদি এটা বিশ্বাস না করে তবে জাতিতেও তাদের বিশ্বাস নেই।''

সারা দেশে মন্ত্রীকে বরখাস্তের জন্য তীব্র প্রতিবাদ উঠলে ঐ মন্ত্রী একটা একেবারেই ভাসাভাসা ও মামুলি 'ক্ষমা প্রার্থনা' করলেন যদি 'তিনি কাউকে আঘাত দিয়ে থাকেন'। এরপর প্রধানমন্ত্রী সংসদকে বললেন ঐ মন্ত্রীর ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিতে ও ব্যাপারটা ভুলে যেতে, কেননা তিনি অনভিজ্ঞ, এই প্রথমবার সাংসদ হয়েছেন এবং গ্রাম্য মহিলা। বিজেপিও এটা বোঝাতে থাকে যে, তিনি অত্যন্ত পশ্চাদপদ জাতের মানুষ বলেই বিরোধীপক্ষ তাঁকে বেছে নিয়ে আক্রমণ করছে।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যা ভারতের গ্রামের নারীদের প্রতি অপমান। নিরঞ্জন জ্যোতি গ্রাম থেকে তাঁর অশালীন ভাষার ঘৃণার ভাষণ শেখেননি। আর এস এস তার বিভিন্ন শাখার নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে এই শিক্ষা দিয়ে চলেছে। বিজেপি ও সংঘ পরিবারের বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন সময়ে যা বলেছেন তার থেকে এটা সহজেই প্রমাণিত হয়।

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা রাম প্রতাপ চৌহান ২০১৩-এর ২১ নভেম্বর আগ্রায় বিজয় শঙ্খনাদ র‍্যালিতে নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতেই একই ধরণের মন্তব্য করেন। মুজফফরনগর দাঙ্গায় অভিযুক্ত সঙ্গীত সোম ও সুরেশ রানার সংবর্ধনাসভা হিসাবে অনুষ্ঠিত ঐ র‍্যালিতে মোদীও ভাষণ দেন। চৌহান 'রামজাদে/ হারামজাদে' নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন এবং রামের ভক্ত 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' এবং রামকে না মানা জাত-বিরোধী মুসলিমদের মধ্যে যে ফারাক করেছিলেন তা নিয়ে মোদী সেদিন কোন আপত্তি করেননি। রাম প্রতাপ চৌহান 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া'র ঘৃণার বচনের সেই সূত্রের পুনরাবৃত্তিও সেদিন করেছিলেন যে সূত্র মোদী নিজেই ২০০২-এর গণহত্যার সমর্থনে তুলে ধরেছিলেন।

২০১১ সালে সুব্রমনিয়াম স্বামী এক ইংরাজি দৈনিকে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন ''ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার যেখানে অ-হিন্দুরা ভোট দেওয়ার অধিকার তখনই পাবে যদি তারা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করে যে তাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিল।'' সুব্রমনিয়াম স্বামী ২০১৩ সালে বিজেপিতে যোগ দেন এবং এখন জাতীয় টেলিভিশনে যাদের মুখ সবথেকে বেশি দেখা যায় তিনি তার অন্যতম।

২০১৩-এর জুলাইয়ে গোয়ার বিজেপি উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে গেছে এবং হিন্দুস্তানে সমস্ত ভারতবাসীই হল হিন্দু।''

নিরঞ্জন জ্যোতির বক্তব্যের সবচেয়ে আপত্তিকর ও ক্ষমার অযোগ্য ব্যাপারটা শুধু এই নয় যে তিনি গালাগালভরা 'বেজন্মা' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ঘোষণা, যে সমস্ত অ-হিন্দু নিজেদের রামের উত্তরসূরী বলে মনে করে না তারা ভারতের প্রকৃত নাগরিক নয়, এটাই ছিল সবচেয়ে ন্যক্কারজনক বিষয়। এই ঘোষণা ভারতীয় সংবিধানের স্পিরিটের বিরোধী। আর রাম প্রতাপ চৌহান, সুব্রমনিয়াম স্বামী বা ফ্রান্সিডি সুজা সহ বিজেপি নেতৃবৃন্দ নিয়মিতভাবেই এই ধরণের মন্তব্য করে চলেছেন।

এগুলো খেয়ালখুশিমতো চলা কোন ব্যক্তি নেতার আলটপকা মন্তব্য নয়। দ্বিতীয় সরসংঘচালক এম এস গোলওয়ালকার লিখেছিলেন, ''হিন্দুস্তানে বিদেশী জাতিগুলোকে হয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে সম্মান করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে হবে, হিন্দু জনসমষ্টি ও সংস্কৃতি, অর্থাৎ হিন্দু জাতিকে গৌরবান্বিত করা ছাড়া অন্য ভাবনাকে আমল দিতে পারবে না এবং তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মুছে ফেলে হিন্দু জনসমষ্টির সঙ্গে মিশে যেতে হবে, অথবা তারা এদেশে থাকতে পারবে হিন্দু জাতির পুরোপুরি অধীনস্ত হয়ে, কোনকিছু দাবি করতে পারবে না, কোন বিশেষ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবে না, পক্ষপাতমূলক কোন আচরণ—এমনকি নাগরিক অধিকারের কথা তো ওঠেই না।'' স্বামী অথবা নিরঞ্জন জ্যোতি বা রাম প্রতাপ চৌহানরা যা বলছেন তা তাঁদের নায়ক আর এস এস প্রধান গোলওয়ালকারের এই খোলাখুলি ফ্যাসিবাদী উচ্চারণের চর্বিতচর্বণ মাত্র।

গোলওয়ালকারের উত্তরাধিকারী আর এস এস প্রধান মোহন ভগবত ২০১৪-এর আগস্ট মাসে বলেন, ''হিন্দুস্তান হল হিন্দু রাষ্ট্র ... এদেশের বর্তমান অধিবাসীরা এই মহান সংস্কৃতির উত্তরসুরি।''

হিন্দু রাষ্ট্রের এই বিভেদমূলক ধারণা, যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সম নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে, হল আর এস এস এবং বিজেপির এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও লক্ষ্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ঐ ধরণের মন্তব্য পরিহারের জন্য নিরঞ্জন জ্যোতিকে বলতে হচ্ছে, কেননা ঐ মন্তব্য ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী। পরে দিল্লীর ত্রিলোকপুরির এক জনসভায়—যে এলাকা বিজেপির উসকিয়ে তোলা সাম্প্রদায়িক হিংসা থেকে সবে উঠে দাঁড়াচ্ছিল—নিরঞ্জন জ্যোতি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বিদ্রুপ করেন যাঁরা তার বক্তব্যের ''সমালোচনা করেছিল'' এবং তিনি বলেন তাঁর বার্তা অপরিবর্তিতই থাকছে, তবে ''বুদ্ধিমানদের কাছে একটা ইঙ্গিতই যথেষ্ট''।

ভারতে ঘৃণার বচনগুলোকে যা সাহস যোগায় তা হল ঐ সমস্ত বক্তব্যের জন্য কোন শাস্তি না হওয়া, এমনকি নির্লজ্জতম ঐ ধরণের উক্তিরও কোন শাস্তি হয় না।

লোকসভায় নির্বাচনী প্রচারের সময় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ মুসলিমদের উদ্দেশে বলেন তারা এমন এক ''সম্প্রদায় যারা আমাদের মা ও মেয়েদের ধর্ষণ করে।'' ঐ একই নির্বাচনী প্রচারে মোদীও মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন তারা এমন সম্প্রদায় যারা ''গোহত্যা করে'' (তিনি অবশ্য এ কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, নেপালে হিন্দু আচার বছরের কোন সময়ে ব্যাপক সংখ্যক মোষ হত্যা দাবি করে)।

২০০২-এর গণহত্যার পরবর্তী পর্যায়ে ২০০২-এর সেপ্টেম্বরে গুজরাট গৌরব যাত্রার সময় মোদী নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''আমাদের কি ত্রাণ শিবির চালানো উচিত? আমাদের কি বাচ্চা পয়দা করার কেন্দ্র খোলা উচিৎ? আমরা পাঁচ আমাদের পঁচিশ—গুজরাটের কি পরিবার পরিকল্পনার দরকার নেই? এর মধ্যে ধর্ম আসে কি ভাবে? এর মধ্যে সম্প্রদায়ের কথা আসে কি করে?'' ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমদের জন্য তৈরি ত্রাণ শিবিরগুলো সম্পর্কে এই অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন!

নিরঞ্জন জ্যোতিকে মন্ত্রীত্বে রেখে দিয়ে মোদী ও তাঁর সরকার প্রমাণ করল যে, 'উন্নয়ন' সম্পর্কিত সমস্ত বুলির পিছনে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের রয়েছে ঘৃণা ছড়িয়ে ভোট কুড়োনোর অন্যতম প্রধান রণনীতি। ঘৃণা ছড়ানোর রাজনীতিকে প্রতিহত করে সমস্ত ধর্মীয় মতবাদের জনগণের জন্য সাংবিধানিক সমতা ও অধিকারের জোরালো অঙ্গীকারের আত্মঘোষণার লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৯ ডিসেম্বর ২০১৪)

লুধিয়ানায় বিশাল বাম জনসমাবেশ

সি পি আই, সি পি এম (পাঞ্জাব), সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এবং সি পি আই (এম)-এর উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় এক বিশাল হুঁশিয়ারি র‍্যালি সংগঠিত হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের এই বিশাল সমাবেশ আকালি-বিজেপি চালিত বাদল সরকারের কাছে অত্যন্ত জোরের সাথে 'সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি প্রতিরোধক বিল ২০১৪' তুলে নেওয়া এবং ১৪ দফা দাবি সনদ মেনে নেওয়ার দাবি তুলে ধরে। এই জনসভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত, বর্ষীয়ান সি পি আই নেতা এ বি বর্ধন, সি পি এম (পাঞ্জাব)-এর সম্পাদক মঙ্গতরাম পাসলা এবং সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। অন্যান্য কিছু বাম নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড প্রকাশ কারাত তাঁর বক্তব্যে বলেন, মোদী সরকার শুধু আম্বানি ও আদানিদের জন্যই সুদিন এনেছে, আর সরকার অন্যদিকে জনগণের ওপর আক্রমণকে বাড়িয়ে চলেছে। পাঞ্জাবে বামেদের এই বিশাল জমায়েতকে এক নতুন সূচনা বলে তিনি বর্ণনা করেন। কমরেড এ বি বর্ধন বাদল সরকারের বিরুদ্ধে বামেদের এক বড় আকারের আত্মঘোষণার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন। কমরেড পাসলা, ভগৎ সিং-এর অনুপ্রেরণাদায়ী উত্তরাধিকার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, একমাত্র স্বাধীন বাম আত্মঘোষণার মধ্যে দিয়েই জনগণের প্রকৃত লড়াইটা গড়ে তোলা সম্ভব এবং বামেদের এই বিশাল জনসমাবেশ সেই সম্ভাবনাকেই দেখিয়ে দিচ্ছে।

কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ভারতের ৩৯ জন শ্রমিকের ইরাকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরে বলেন, এঁদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সরকার মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। এঁদের অবিলম্বে ও নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার এখন কেন পিছু হঠছে তার জন্য সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করতে হবে। পাঞ্জাবের আকালি-বিজেপি সরকার যে জনগণের সম্পত্তি রক্ষার নামে সমাবেশিত হওয়ার ও প্রতিবাদ জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করতে চাইছে, সরকারের সেই পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে মুখের মত জবাব দেওয়ার আহ্বান তিনি জানান।

কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য আরও বলেন, নতুন সরকার পুরোদস্তুর কর্পোরেটপন্থী সরকার হয়ে উঠেছে এবং আম্বানি-আদানিদের স্বার্থরক্ষাই এই সরকারের কাছে আরাধ্য। শ্রমিক, কৃষকদের রক্ষা, জমি, জীবিকা ও পরিবেশ সুরক্ষার আইনগুলোকে সরকার নখদন্তহীন করে তুলছে যাতে করে দেশীয় ও বহুজাতিক বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো দেশের সম্পদকে গ্রাস করতে পারে, অর্থ লুণ্ঠন করতে এবং শ্রমিকদের শোষণ করতে পারে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র জবাব হতে পারে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন। সংঘ পরিবারের নামিয়ে আনা সার্বিক আগ্রাসনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম ক্ষেত্রে তাদের সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ ও ধর্মীয় গোঁড়ামিবাদী এজেণ্ডাকে চাপিয়ে দিতে চাইছে। আমাদের জাতীয় সম্পদ ও অধিকার, ইতিহাস ও জনগণের সংহতির ওপর এই সার্বিক আক্রমণকে পরাস্ত করার গুরুত্বকে তিনি জোরের সাথে তুলে ধরেন। পাঞ্জাবে বামেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে কৃষি শ্রমিক ও ছোট চাষিদের, শ্রমিক ও কর্মচারীদের, যুবক ও নারীদের সংগ্রামকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আহ্বান তিনি জানান।

সেদিনের সমাবেশ থেকে যে দাবিগুলো তোলা হয় তার মধ্যে আরও ছিল—৩,০০০ টাকা করে বার্ধক্য/বিধবা ভাতা দিতে হবে; গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে; ন্যূনতম মজুরির হার ১৫,০০০ টাকা করতে হবে এবং মাদক পাচারচক্র, বালি-পাথর-পরিবহণ-কয়লা মাফিয়াদের অবৈধ কার্যকলাপকে রোধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

'ঘর ওয়াপসি'র অভিযান সাম্প্রদায়িক ত্রাস ছড়ানোরই অপরাধ

সংঘীরা বলছেন ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম, বুদ্ধধর্ম-তে ধর্মান্তরকরণ হলে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে 'ঘর ওয়াপসী'-তে (ঘরে ফিরে আসতে) আপত্তি কেন? বেশ, আমরা একথাও স্মরণে রাখছি যে এই সংঘীরাই বলেন যে, যদি স্বেচ্ছায় নিজেরা চুমু খেতে পারেন তাহলে ধর্ষণের বিরোধিতা করেন কেন।

আমার অনুমান এরা সম্মতি ও নিপীড়নের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে স্ব-ইচ্ছাতেই অন্ধ থাকেন। সেই কারণেই এরা একজন হিন্দু নারীর একজন মুসলমান যুবকের প্রতি ভালোবাসাকে 'জেহাদ' বা 'ধর্ষণ' বলে ছাপ দেন যতই সেই মেয়েটি স্বয়ং আর্তনাদ করে বলুন যে 'প্রলোভন' নয়, নিজের **পছন্দেই** তাঁর ভালোবাসা।

নিজ ধর্ম প্রচার করা, মানুষকে ধর্মান্তরিত হওয়ার আবেদন করা, এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত **মৌলিক অধিকার**। জাতভিত্তিক প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি, অথবা লঙ্গরখানার প্রতিশ্রুতি বা স্কুলশিক্ষার, যে প্রতিশ্রুতিগুলো, ধরুন, বুদ্ধধর্মী বা শিখ বা মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো দিয়ে থাকে মোটেই 'প্ররোচনা' বা 'প্রলোভন' নয়—এমনকি এই প্রতিশ্রুতিগুলো পুরোপুরি রক্ষিত না হলেও। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অন্য দলের সমর্থকদের আনুগত্য বদল করতে যে প্রতিশ্রুতি দেয় বা কোন কর্পোরেট হাউস আরও ভালো মজুরির কথা বলে যে অন্য চাকরি ছেড়ে তাদের সংস্থায় আসতে বলে তার থেকে আলাদা কিছু নয় ...।

'ঘর ওয়াপসি' কোনভাবেই ধর্মান্তরকরণ নয়। এটা একটি প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শন। এটি বাংলাভাষি মুসলিমদের এই কথা বলার একটি মাধ্যম যে ''মুসলিম হয়ে থাকুন, তাহলে আমরা আপনাকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বলে দৌড় করাতে পারি; হিন্দু হয়ে যান তাহলেই একমাত্র আপনি বি পি এল কার্ড বা রেশন কার্ড বা আবাস যোজনা পাওয়ার যোগ্য।''। বি পি এল, রেশন কার্ড বা আবাস যোজনা কখনই লঙ্গরখানা ইত্যাদির সাথে তুলনীয় হতে পারে না কারণ এগুলো হল **স্বীকৃত অধিকার** যা রাষ্ট্র তার প্রতিটি সদস্যকে দিয়ে থাকে এবং যেগুলো কোন ধর্মীয় সংগঠন বা রাজনৈতিক দলই ধর্মের নামে দিতে বা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। এই অর্থে আগ্রায় 'ঘর ওপায়সি' অভিযানে ধর্মান্তরিত হলে বি পি এল কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আসলে রামজাদা/হারামজাদা বিভাজনের বাস্তব প্রয়োগ ঃ মুসলিমদের এই কথা বলা যে নাগরিকত্বের অধিকারগুলো তারা পেতে পারেন যদি তারা সংখ্যাগুরুর ধর্ম গ্রহণ করেন।

আগ্রা পরিঘটনাকে সমালোচনা করতে গিয়ে অ-বিজেপি দলগুলোর উচিত সংঘ প্ররোচিত 'ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ' বিতর্কে ভেসে না যাওয়া। 'ঘর ওয়াপসি' যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পেশী-প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয় তা আগ্রা কাণ্ডের বাস্তবতায় প্রমাণিত। সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা তৈরির বিরুদ্ধে যে আইন বর্তমানে আছে তাকে প্রয়োগ করেই একে থামাতে হবে, গুজরাট ধাঁচের 'ধর্মান্তরকরণ বিরোধী' আইনের মত কোন কেন্দ্রীয় আইন বানিয়ে নয়, যে আইনে 'ঘর ওয়াপসি'কে **উৎসাহিত** করা হয়েছে আর হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে পরিবর্তিত হওয়াকে অপরাধ বানানো হয়েছে! লোকসভা নির্বাচনের সময় এক সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেন যে 'বলপূর্বক/প্ররোচিত' ধর্মান্তরকরণ অপরাধ কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারেই 'ঘর ওয়াপসি'কে কখনই 'বলপূর্বক' বলা যাবে না, কারণ হিন্দুত্বে 'ফিরে আসা' মোটেই ধর্মান্তরিত হওয়া নয়!

স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্মে পরিবর্তিত হওয়া বা এমনকি হিন্দু ধর্মবিশ্বাস প্রচার করা (যেমনটি বিভিন্ন ধর্মীয় ধারাগুলো করে থাকে, বিভিন্ন ধর্মগুরুরা কারও কোনো আপত্তি ছাড়াই যা করে থাকে) নিশ্চিতভাবেই কোন সাম্প্রদায়িকতাবাদী কার্যকলাপ নয়। কিন্তু হিন্দুত্বকে 'ঘর' আর অন্য সব ধর্মকে 'বিদেশ' হিসাবে দাবি করা; উচ্ছেদ ও ধরপাকড়ের ভয় দেখিয়ে 'ঘর ওয়াপসি' অভিযান চালানো এবং নাগরিকত্বের স্বীকৃতিসূচক কাগজপত্র আটকে দিয়ে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা অবশ্যই অপরাধ, সাম্প্রদায়িক ত্রাস ছাড়ানোরই অপরাধ।

- কবিতা কৃষ্ণাণ

(ফেসবুক থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৪)

সাম্প্রদায়িকতা ও কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে হুগলীতে ৮ বাম দলের যুক্ত উদ্যোগ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কর্পোরেট নীতি ও উগ্র বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক প্রচার ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রচার আন্দালন গড়ে তোলার লক্ষ্যে দিল্লীতে ৬ বাম দলের গৃহীত ৯ দফা দাবিতে দেশব্যাপী প্রচার আন্দোলনের অংশ হিসাবে হুগলীতে গত ১০ ডিসেম্বর শ্রীরামপুর রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কনভেনশন। ১৪ ডিসেম্বর চুঁচুড়া ঘড়ি মোড়ে বামপন্থী দলগুলোর ডাকে অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, এ রাজ্যে সারদা দুর্নীতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে জেরার আওতায় আনার দাবিতে এক প্রতিবাদী সমাবেশ।

এই প্রচার অভিযানে সামিল হয় সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সি পি আই (এম), আর এস পি, সি পি আই, এস ইউ সি আই (সি), ফরওয়ার্ড ব্লক সহ মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং পি ডি এস।

বর্ধমানের খাগড়াগড় ঘটনার পর রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আর এস এস, সংঘ পরিবার ও বিজেপি এক পরিকল্পিত বিদ্বেষ ছড়ানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। একদিকে গরিব মানুষের আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলো কাটছাঁট করা ও পরিকল্পিতভাবে এক ফ্যাসিস্ট হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার বিজেপির অ্যাজেণ্ডার বিরুদ্ধে জনগণের অধিকারের সপক্ষে ১০ ডিসেম্বর কনভেনশনে জেলার শহরাঞ্চলের ও গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু বাম কর্মী সমর্থক সামিল হন। কনভেনশনে সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সিঙ্গুরের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের জমি রক্ষার আন্দোলন সহ জেলার কৃষক-ক্ষেতমজুর আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা ও শিক্ষক সজল অধিকারী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের যে বহু ঐতিহ্য আছ, আর এস এস-বিজেপি তার মূলেই আঘাত হানতে চাইছে। এই শক্তিকে বাড়তে দিলে তা মেহনতী মানুষের ঐক্যকেই ধ্বংস করবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বাগাড়ম্বর প্রদর্শন আসলে ক্ষমতা বজায় রাখতে এক রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই না। বর্ধমানের খাগড়াগড় ঘটনার পর রাজ্যে তদন্তে এসে কেন্দ্রের মোদী সরকার নিয়ন্ত্রিত 'নিয়া' যেভাবে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়ায় তার পরিপ্রেক্ষিতে সজল অধিকারি বলেন, আসলে বর্ধমানের ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করার চেয়ে কেন্দ্রের সরকার নিয়ন্ত্রিত 'নিয়া'র সক্রিয়তা বেশী সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়ানোয়। তাই 'নিয়া'র তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অধিকারী। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) নেতা রূপচাঁদ পাল, আর এস পি নেতা মৃন্ময় সেনগুপ্ত, সি পি আই নেতা শুভজয় দাশগুপ্ত, এস ইউ সি আই নেতা প্রদ্যোত, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন দে, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের চণ্ডী গাঙ্গুলী। বক্তারা সকলেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলার ওপর জোর দেন। কনভেনশন পরিচালনা করেন সি পি আই (এম) জেলা সম্পাদক সুদর্শন রায়চৌধুরী সহ ৭ সদস্যের এক সভাপতিমণ্ডলী। কনভেনশনের গৃহীত প্রস্তাব ও বাম দলগুলোর নেতৃত্বের বক্তব্যের সারমর্মকে সর্বসম্মতিতে গ্রহণ করে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাম কর্মী সমর্থকরা ফিরে যান তাদের এলাকায় সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

১৪ ডিসেম্বর চুঁচুড়া ঘড়ি মোড়ে বামপন্থী দলগুলোর ডাকে এক প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মূলত হুগলী-চুঁচুড়ার বাম কর্মী-সমর্থকরা সামিল হন। সমাবেশ থেকে রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সারদা দুর্নীতির তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রীকে জেরার আওতায় আনার দাবিও তোলা হয়। সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন পার্টির হুগলী-চুঁচুড়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও হুগলী জেলা কমিটির সদস্য স্বপন গুহ। দ্বিধাহীন ভাষায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে থেকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে কংগ্রেসের ধারাবাহিক আত্মসমর্পণকে তুলে ধরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করার সাথে সাথে কংগ্রেস সম্পর্কেও সতর্ক থাকার আবেদন জনগণের কাছে রাখেন। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) হুগলী-চুঁচুড়া জোনাল সম্পাদক মনোজিত ঘোষ, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীর রায়, আর এস পি-র কিশোর সিং। কর্মসূচী চলাকালীন মদন মিত্রকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি মিছিল বামেদের সমাবেশের প্রতি হুমকি দিতে দিতে এগিয়ে এসে সমাবেশ পণ্ড করতে চেষ্টা করে, তবে পুলিশের হস্তক্ষেপের কারণে সমাবেশ পণ্ড করতে পারেনি। শহরের গণতান্ত্রিক মানুষ আরও একবার প্রত্যক্ষ করলো তৃণমূল কংগ্রেসের অরাজকতার নমুনা।

সারদা প্রতারণায় জড়িত তৃণমূল নেতাদের বিচার চাই!

সারদা অর্থনৈতিক প্রতারণায় জড়িত পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রকে মন্ত্রীসভা থেকে বহিষ্কার এবং তৃণমূলের অন্য অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের বেহালা আঞ্চলিক কমিটি পূর্ব বেহালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল করে।

কালো পুঁজির পাহারাদার ও লুম্পেন পুঁজির ঠিকাদার দ্বৈরথ
গণ আন্দোলন তীব্রতর করুন

জাতীয় হোক বা আঞ্চলিক, আমাদের শাসক দলগুলোকে চিনতে তিন, চারটি শব্দই যথেষ্ট। **প্রতিশ্রুতি**, **প্রতারণা**, **লুঠ** ও **দমন**। প্রথম তিনটি কাজ বা অ-কাজ ভালভাবে চললে, চতুর্থ কাজটি একটু দেরিতে দরকার হয়। তবে কাজগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, একে অপরকে প্রভাবান্বিত করে, কখনও কখনও **ওভারটেক** করে।

যেমন ধরুন, কালো টাকা উদ্ধারের গল্প। সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক সন্তান বিজেপি কালো টাকা উদ্ধারের জন্য সংসদে ও সংসদের বাইরে কত না হৈ চৈ করল। অরুণ জেটলি থেকে সুষমা স্বরাজ সংসদে কত কথাই না বললো। বলতে গেলে 'গীতা' হয়ে যাবে। শেষে আসরে নামানো হল নরেন্দ্র মোদীকে। লোকটি বড় ধরণের ঝানু প্রতারক। ও জানে সংসদে বলে লাভ নেই, ওটা 'টকিং শপ'। বরং দেশের আম জনতার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক। ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় এই 'ভদ্রলোক'-টি পাড়ায় পাড়ায়, জনসভায় জনসভায় বলে বেড়ালেন ক্ষমতায় এলে এক মাসের মধ্যে সব কালো টাকা উদ্ধার করা হবে। এখানেই থামলেন না, প্রতিটি (বিশেষত গরিব-গুর্ব্বো) পরিবারের নামে মাথাপিছু ৩ লাখ করে ১৫ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া হবে (পরিবারে ৫ জন করে ধরে নিয়ে)। সে কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। তার কি হলো পরে বলা যাবে। আমরা বরং কালো টাকা উদ্ধারের নাটক-টাকে একটু দেখে নিই।

কালো টাকা (ব্ল্যাক মানি) হল কালো বাজারে অর্জিত টাকা, যার জন্য কোন ট্যাক্স বা কর না দিয়ে 'ভাগ্যবান' ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান টাকাগুলো **ভোগ** করেন, **জমিয়ে** রাখেন বা **সমান্তরাল অর্থনীতি** চালিয়ে যান। টাকার যেহেতু সাদা বা কালো কোন রঙ-ই থাকে না, তাই অবাধে এই টাকা বাজারে ফাটকা পুঁজি হিসাবে চলাচল করে (দেশে বা বিদেশে)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর বা অন্যান্য আধিকারিকরা এর কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেন না।

এই কালো টাকার পরিমাণ কত? ভারতের অসাধু ব্যক্তিরা বিদেশে কত টাকা কালো পথে পাচার করেছে? সুইজারল্যাণ্ডের সরকার ও সুইস ব্যাঙ্কারস অ্যাসোসিয়েশন একবার জানালো, এই টাকার পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার (১ ডলার = ৬২-৬৫ টাকা)। সংসদে বিতর্ক উঠলো পরিমাণ নিয়ে এবং ডিপোজিটরদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে। ২০১২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে **সি বি আই**-এর ডিরেক্টর জানালেন বিদেশী ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের অবৈধ টাকার পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি)। ২০১২-এর মার্চ মাসে **ভারত সরকার সংসদে** বিবৃতি দিল ঃ সি বি আই ডিরেক্টরের হিসাব **আনুমানিক ও প্রাথমিক ধারণামাত্র** (ভারতের উচ্চ-ন্যায়ালয়ে সি বি আই ডিরেক্টর একথা বলেছিলেন)। অরুণ জেটলি অ্যাণ্ড কোম্পানী সংসদে সে কি হৈ চৈ করল। নাম প্রকাশ করা হোক, টাকা ফিরিয়ে আনা হোক। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ও পরবর্তীতে চিদাম্বরম জলদ-কণ্ঠে ভাষণ দিলেন, সরকার চেষ্টা করছে, একটু সময় দিন! আগে একটা কথা চালু ছিল ঃ সরকারের ১৮ মাসে বছর হয়। ১৮ সংখ্যাটি কে ঠিক করল জানা নেই। কালো টাকা উদ্ধারে বছর এখন ৩৬ মাসেও হয় কিনা সন্দেহ! ২০০৯ সালে সুপ্রীম কোর্টে আইনজীবী রাম জেঠমালানী ও অন্যান্য একটি রিট পিটিশন (সিভিল) করেছিলেন (কেস নং ১৭৬, ২০০৯)। ২০১১-এর ৪ জুলাই সুপ্রীম কোর্ট প্রাক্তন বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডির নেতৃত্বে ও তদারকিতে কালো টাকা উদ্ধারে স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টীম (সিট) গঠন করল। জানালো যে, অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থা বা সরকারকে নয়, সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। খেলা গড়াল সুপ্রীম কোর্টে। বিচারপতি জীবন রেড্ডি যেহেতু অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, তাই তার কোন রিপোর্ট বা পর্যবেক্ষণ মানতে রাজী নয় কেন্দ্রীয় সরকার। মামলা গেল বিচারপতি আলাতামাস কবীর ও বিচারপতি এস এস নিজ্জরের বেঞ্চে। এবার বিচারপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ সরকার নাম জানাতে বাধ্য কিনা? বিচারপতি আলতামাস বললেন '**না**', বিচারপতি নিজ্জর বললো ''**হ্যাঁ**''। সরকার সাকুল্যে ১১ জনের একটি তালিকা 'খামবন্দী' করে সুপ্রীম কোর্টে জমা দিল। ২০১৪-এর ২৭ অক্টোবর **মোদী সরকার** মাত্র **তিন জনের** নাম ''খামবন্দী'' করে কোর্টে জমা দিল। সুপ্রীম কোর্টে কতদিনে বছর হয়, শিশুদের তা ভাল করে শেখানো দরকার। অবশেষে দেশব্যাপী হৈ চৈ-এর পর **২৯ অক্টোবর ২০১৪** সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে নরেন্দ্র মোদী সরকার ৬২৭ জনের এক ''খাম-বন্ধ তালিকা'' সুপ্রীম কোর্টে জমা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, এ তালিকা প্রকাশ করা যাবে না। কেননা তার ফলে ''দেশের **ঐক্য-নিরাপত্তা** ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (মোদী সরকারের ২ নং পদাধিকারী) অরুণ জেটলি হাস্যরস সহ একথাও জানিয়েছেন, ''বিরোধীপক্ষে থাকলে যে কথা বলা যায়, সরকারে এসে সে কাজ করা যায় না। সরকারকে **সবদিক** বিবেচনা করতে হয়''। অপরাধীদের নামের তালিকা প্রকাশ করলে দেশের ঐক্য, নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক সুস্থিতি কিভাবে নষ্ট হয়? অন্যান্য দেশের সঙ্গে (পড়ুন, আমেরিকা, ব্রিটেন ইত্যাদি প্রভৃতি) সম্পর্ক কেন খারাপ হয়, তার কোন ব্যাখ্যা বাগ্মী আইনজীবী অরুণ জেটলি বিশদে বলতে রাজী নন!!

হাসান আলি-র কেসটা একটু বিবেচনা করুন। ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) ও আয়কর বিভাগ বিদেশী ব্যাঙ্কে ৩৬০ বিলিয়ন ডলার কালো টাকা গচ্ছিত রাখার অপরাধে **২০০৭ সালে** হাসান আলিকে গ্রেপ্তার করলো। পুণা রেসকোর্সের ঘোড়া খেলার একটা বড় চাঁই এই হাসান আলির বিরুদ্ধে **আন্তর্জাতিক অস্ত্র-চোরাচালানকারী** আদনান খাসোগী-র সঙ্গে গোপন যোগাযোগের তথ্য দিল **ইডি**। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সংসদে জানালেন সরকার **অত্যন্ত গুরুত্ব** দিয়ে হাসান আলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখছে। কয়েক বছর তদন্ত করার পর ঐ একই প্রণববাবু **সংসদে** বললেন হাসান আলির অ্যাকাউন্টে কোন টাকাই নেই। ঐ নামে কোন অ্যাকাউন্টও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলো কতটা দক্ষ ও করিৎকর্মা হাসান আলি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে!! দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক প্রণব মুখার্জী ও মনমোহন সিং-দের জমানা খতম, এবার এসেছে **স্বচ্ছ ভারতের** রূপকার নরেন্দ্র মোদীর জমানা। কালো টাকা এখনও কালো-ই থেকে গেল, আলোর মুখ দেখলো না। ঝাড়ু হাতে ঘুরে বেড়িয়ে ছবি তোলা যায়। কালো টাকায় যে মুখ ঢেকে আছে। মোদী সাহেব একটু জবাব দিন!

পূর্বতন সরকারের জমানায় যে যুক্তিতে এই সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা হচ্ছিল, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বিজেপি নেতা ও আইনজীবী সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী সংসদে ও সুপ্রীম কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ডি টি এ এ (ডাবল ট্যাক্স এভয়ডেন্স অ্যাক্ট) কালো টাকার তথ্য প্রকাশে বাধা হতে পারে না। কেবলমাত্র 'সাদা' টাকার অধিকারি ব্যক্তিবর্গকে যাতে ২ দেশেই ট্যাক্স দিতে না হয়, তার জন্যই ডি টি এ এ প্রযোজ্য! সহযাত্রী আইনজীবী অরুণ জেটলি মহাশয় এখন কি বলেন? এইচ এস বি সি-র কালো টাকা উদ্ঘাটনের নায়ক হার্ভ ফেলসিয়ানি (তাঁর আইনজীবী টিমের পক্ষ থেকে) এন ডি টি ভি-র এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ''আরও এক হাজার গুণ তথ্য'' তাঁদের হাতে রয়েছে। তাঁরা ২০০ জিবি-র মধ্যে মাত্র ২ এম বি তথ্য প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক কনসোরটিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস্ (আই সি আই জে) বা জুলিয়েন অ্যাসাঞ্জ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কার কার নাম, কত কালো টাকা দেশে-বিদেশে লুকানো আছে, সহজেই জানা যাবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! **কালো টাকার পাহারাদার** কংগ্রেস বা বিজেপি বা তাদের পরিচালিত ইউ পি এ কিংবা এন ডি এ সরকার কেউই সে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে রাজী নয়। হবেই বা কি করে। ঐ জন-ধন অ্যাকাউন্টের মালিকদের কালো সম্পত্তির পয়সায় ওদের ভোট জেতা, মন্ত্রী হওয়া, সুদিন ও স্বচ্ছ ভারতের ডাক দেওয়া। কালোয়াররাই এখন দেশ চালাচ্ছে। প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণার এই ককটেলের নাম **মেক ইন ইণ্ডিয়া**!

এবার আমরা বরং **সততার প্রতীকের** দিকে একটু নজর ফেরাই। হোর্ডিংগুলো খুলে ফেললেও তিনি আছেন এবং গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত তিনি থাকবেন। তিনি অর্থাৎ মা-মাটি-মানুষের সরকারের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। অনেকেই ভেবেছিলেন 'গণআন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহের' চূড়ায় বসে ক্ষমতার দিকে তাঁর এই যাত্রা রাজ্যে সত্যিকারের একটা পরিবর্তন আনবে। ছোট-বড় কিছু বামপন্থী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের অগ্রণী মানুষ 'পরিবর্তনের' এই কোরাসে গলা মিলিয়ে ছিলেন। এমনকি এ পর্যন্ত ভেবেছিলেন যে তাঁরাই বস্তুত মমতা ব্যানার্জীকে 'নিয়ন্ত্রণ' করতে সক্ষম হবেন। কত বিচিত্র তত্ত্ব কথা—**গণআন্দোলনে ঐক্য**, **সাব-অল্টার্ণ রাজনীতি**, **গণআন্দোলনের ক্ল্যাসিক মডেল**, **বর্ষসেরা বাঙালী** এই বাংলায় শোনা গেল। তাঁরা কেউ-ই ভাবলেন না রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। মমতা ব্যানার্জী একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনীতির প্রতিনিধি এবং তাঁর **মূল** সামাজিক ভিত্তি ঐ অর্থনীতির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে। প্রথম ১০-১৫ বছরের সংস্কার কার্যক্রম শেষ হয়ে যাওয়ার পর বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দুই দশকে বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি চরম বন্ধ্যাত্বের মধ্যে পড়ে যায়। সিণ্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, প্রমোটার-বিল্ডার্স রাজ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে দেয়। অর্থনীতির মূল মূল ক্ষেত্রগুলো—কৃষি সংকটগ্রস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে, শিল্প বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং, চটশিল্প, চা-বাগান, ইস্পাত শিল্প চরম বন্ধ্যাত্বের মধ্যে পড়ে যায়। এর কদর্য নমুনা দেখা যায়, চটশিল্পে ও চা-বাগানগুলোতে। চটশিল্পে শিল্পপতিরা টাকা পাচার করে দেয়, একদল ভুঁইফোড় পাট ব্যবসায়ী ও সাপ্লায়ার চট কলগুলোর মালিক-প্রমোটার বনে যায়। যাদের প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়ায় ব্যাঙ্ক ঋণ লোপাট করা; পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির টাকা লুট করা। চা-বাগানে চলে নিত্য অনাহার, মৃত্যুকে সঙ্গী করে মালিকদের বাগান লুটের কাহিনী।

লুম্পেন অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তের এই তো প্রেক্ষাপট। একদল চিটফাণ্ড কারবারি এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। দারিদ্র্য পীড়িত, বিষণ্ণ-বিষাদগ্রস্ত মানুষ যেমন 'দেবতার' থানে মাথা ঠোকে, ঠিক সেই একই মানসিক অবস্থায় তারা অধিক লাভের আশায় চিটফাণ্ডগুলোর প্রলোভনে পা দেয়। বামফ্রন্ট আমলের শেষদিকে এদের পঞ্জি ব্যবসা শুরু হলেও বড় ধরণের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তাদের বাড়বাড়ন্ত সম্ভব নয়। বামফ্রন্ট গেল টাটা, সালিম, জিন্দালদের কাছে, মমতা দৌড়ালো সুদীপ্ত সেন, গৌতম কুণ্ডু ইত্যাদি প্রভৃতি চিটফাণ্ডওয়ালাদের কাছে। বামফ্রন্টের প্রচেষ্টা গুরুতর ধাক্কার মুখে পড়ায়, দ্বিতীয় ধরণের কারবারীদের ব্যবসা রমরম করে ফুলেফেঁপে ওঠে। আনুমানিক একটা হিসাবে, এরাজ্যে প্রায় ৭২-৭৪টা পঞ্জি ব্যবসা গত ৫-৬ বছরে প্রায় ৬০,০০০ কোটি টাকার **সমান্তরাল অর্থনীতি** চালু করে দেয়। মদন মিত্র এটাই বলতে চেয়েছিল নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে—'বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত হওয়া'। এই সিন্ধু বানাতে যত বাধা আসবে তাকে প্রতিহত করতে মদন মিত্র, মুকুল রায়, কুণাল ঘোষ, সৃঞ্জয় বোস, শিশির অধিকারী, আরও আরও তথাকথিত সাব-অল্টার্ণ রাজনীতিবিদ, টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যজগতের পরিচিত মুখেরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পাড়ায় পাড়ায় আদি ও নব্য-তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই এই মহাযজ্ঞে 'এজেণ্ট' হিসাবে কাজ করেছে। সংখ্যাটা মোটেই কম নয়। মমতা ব্যানার্জী যে ৫-৭ লক্ষ বেকার যুবকের চাকুরির গল্প প্রচার করেন, তার ৯৫-৯৭ শতাংশ এই 'এজেন্ট'-এর চাকুরি। গোটা ব্যাপারটা যাতে রাংতায় মুড়ে ফেরী করা যায়, তার জন্যই সততার প্রতীকের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনকে জনপ্রিয় করতে উৎসব-পারিতোষিক বিতরণ ও খেতাব বিলি। লুম্পেন অর্থনীতি যেহেতু স্থায়ী ও উৎপাদন শিল্প এবং বিকাশের রাস্তায় হাঁটতে পারে না, তাই চাকচিক্য ও শোভাবর্দ্ধনের জন্য একই সেতু বা সড়ক নতুন করে রং করে উদ্বোধন, একই প্রেক্ষাগৃহ বা হাসপাতালের নতুন নতুন নামকরণ চলতেই থাকে। কিন্তু কোন বন্ধ কারখানা খোলে না, কোন রুগ্ন শিল্প বা চা-বাগানের পুনরুজ্জীবন ঘটে না। অর্থনীতি ক্রমাগত নৈরাজ্যের কবলে পড়ে। ফাঁস যত গলায় চেপে বসে, মানুষের স্বাভাবিক কথা বলা তত বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে। তৃণমূল নেত্রীর সাম্প্রতিক কথাবার্তায় তার লক্ষণগুলো ফুটে বের হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির পাকা খেলোয়াড়রা চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। আদি গোদরেজের শহর ও গ্রামে জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার দাবি বা মুকেশ আম্বানীদের চাপে কৃষি বিপণনে বহুজাতিক পুঁজি, কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য কৃষি বিপণন বিল পাশ, চুক্তি চাষের অবাধ সুযোগ ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো এরই ফসল। এ খেলা এখানেই থামবে না। বীমা-প্রতিরক্ষা-রেল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে **এফ ডি আই** অনুপ্রবেশে যাতে তৃণমূলী সাংসদরা কোন বাধা হতে না পারে, সে চেষ্টাও অব্যাহত। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় এখন তাই দেখার।

আমরা যারা জনগণের জন্য রাজনীতি করি তারা কি এই দুই দুর্নীতিগ্রস্ত, অপরাধী সরকার ও দলগুলোর দ্বৈরথ দেখতে থাকবো? কালো টাকার পাহারাদাররা বা স্ক্যাম-লাঞ্ছিত 'সততার' সরকারের বিরুদ্ধে হৈ-চৈ-এ শুধু আনন্দ পাব আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় আনন্দ বিলোচ্ছে তাই নিয়ে মশগুল থাকবো নাকি মুদ্রা সহযোগে চিটফাণ্ডবেষ্টিত নেত্রীর সাব-অল্টার্ণ ভাষা নিয়ে রসিকতা করতে থাকবো? যে কোন সংগ্রামী বামপন্থী কর্মী বা সংগঠনের পক্ষে তা হবে আত্মহত্যার সমতুল। চলুন, আমরা রাস্তায় নামি। একা এবং অন্যকে নিয়ে। এই দুই প্রতারক, জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ-মিছিল সংগঠিত করি। জনসংযোগ অভিযানের যে কর্মসূচী পার্টি হাতে নিয়েছে, তাকে আরও জীবন্ত করি, আপডেট করি। শেষ পর্যন্ত জনগণই নির্ণায়ক ও নির্দ্ধারক শক্তি। জনগণকে সক্রিয় ও সচেতন করার কাজই বিপ্লবী কাজ।

- পার্থ ঘোষ

চটশিল্প কী গভীর খাদের কিনারে?

অনেক দড়ি টানাটানি ও টানাপোড়েনের পর কোনক্রমে এ যাত্রায় টিকে থাকল জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল বা বাধ্যতামূলক আইন, ১৯৮৭। কিন্তু তবুও ঘুচল না চটশিল্পের ভাগ্যাকাশে গভীর অনিশ্চয়তা ও সংকটের কালো মেঘের ঘনঘটা। গোটা পূর্বভারতে চটশিল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে বিরাট একটা প্রশ্নচিহ্ন ঝুলেই থাকল আগামীর দিনগুলোতে।

কি এই জুট প্যাকেজিং মেটেরিয়াল (কম্পালসারি ইউজ ইন্ প্যাকেজিং কমোডিটিজ্) অ্যাক্ট, ১৯৮৭ বা সংক্ষেপে জে পি এম অ্যাক্ট? রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে সিন্থেটিক দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও বাজার দখলের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার পাটশিল্পকে বাঁচাতে উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। ২.৫ লক্ষ চটকল শ্রমিক, ২৫ লক্ষ পাটচাষি এবং এই শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৩ কোটি মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে ঐ আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বাধ্যতা থাকে। পরিবেশ বান্ধব বায়োডিগ্রেডেবেল (অর্থাৎ জীবানুদ্বারা বিয়োজিত হতে পারে) চটের বস্তায় ১০০ শতাংশ খাদ্যসামগ্রী এবং চিনিকে প্যাকেজিং করাটা বাধ্যতামূলক করা হয় জে পি এম অ্যাক্ট মারফত। পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যগুলো চট ব্যাগের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। ফসল (বিশেষ করে গম, চাল) ওঠার সময়ে জুট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (জে সি আই) মারফত বিভিন্ন রাজ্য চটের ব্যাগ ক্রয় করে থাকে। জে সি আই চটকলগুলোকে আগাম প্রতি বছরে উৎপাদনের একটা লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে দেয়। তার ভিত্তিতে চটকলগুলো উৎপাদন করে। যদিও এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রকের নির্দিষ্ট অভিযোগ যে কোন বছরেই চটকলগুলো সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারে না। আর বিপরীতে চটকল মালিকদের অভিযোগ যে, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক প্রয়োজনের তুলনায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেই লক্ষ্যমাত্রা কাল্পনিকভাবে তৈরি করে, যার আদৌ কোন বাস্তবতা নেই। ঐ আইনের ফলে, চটকল মালিকদের বাজারের অনিশ্চয়তার ওপর আর নির্ভর করতে হল না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চিত আশ্রয়ে লালিত চটজাত দ্রব্য বা বস্তার বিপণন সুনিশ্চিত হওয়ায় চটকলগুলোও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু চটকল শ্রমিকদের ন্যূনতম সমস্যার সুরাহা হল না। চটকলগুলোতে লকআউট, মধ্যযুগীয় শ্রম বিন্যাস ও ব্যবস্থা, সমস্ত শ্রম আইন লঙ্ঘন চটকল মালিকদের একটা দস্তুর হয়ে উঠল।

প্রায় প্রতি বছর জে পি এম আইনকে 'নবীকরণ' করা হয়। শক্তিশালী সিন্থেটিক লবির চাপে জে পি এম আইন আগের থেকে অনেক শিথিল হয়েছে। চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে পা বাড়ালে ঐ আইন আরও শিথিল করার হুমকি আসে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রকের তরফ থেকে। ধাপে ধাপে শিথিল হতে হতে চিনির জন্য সংরক্ষণ বর্তমানে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

চটশিল্পের ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে একটি বৈঠকে জুট কমিশনার বলেন যে, ''দুর্বল চটশিল্পকে সাহায্য করতে একসময়ে জে পি এম আইনকে 'ক্রাচ' হিসাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে এই শিল্পটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু 'ক্রাচ'-এর বদলে এই আইনটি চটমালিকদের কাছে এখন 'হুইল চেয়ারে' পরিণত হয়েছে, যা ছাড়া তারা বাঁচতে পারছে না। স্বাধীনভাবে বাজার ধরতে পারছে না।'' এটা বাস্তব যে এ বছরের খারিফ ফসলের জন্য ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ বেল-এর যে অর্ডার ছিল, তার তুলনায় বিভিন্ন রাজ্যগুলো অনেক কম চটের বস্তা কিনেছে। পাঞ্জাব তার প্যাকেজিং পরিকল্পনা বদলে ফেলায় অনেক কম বস্তা কিনেছে—যা সমস্যাকে বাড়িয়েছে, কারণ পাঞ্জাব হল সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বাংলাদেশ থেকে সস্তায় বেআইনি পথে ব্যাপকমাত্রায় চটের বস্তা ঢুকে পড়ায় তাও বাড়তি সংকট তৈরি করছে।

জুট কমিশনার জানান যে, প্রতি মেট্রিক টন পিছু তারা ৬০,০০০ টাকা চটদ্রব্য ক্রয় করেন, যার মধ্যে শ্রম ব্যয় বা লেবার কস্ট ২০,০০০ টাকা। শ্রমিকদের দেয় মজুরি, মহার্ঘভাতা, বিধিবদ্ধ ছুটি, গ্র্যাচুইটি—এ সব উপাদান নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার চটদ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু দেশের প্রায় ৫৫০টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চিনি কলের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তাদের চটের বস্তা কেনার জন্য বাধ্য করা যাচ্ছে না। সরকারি/সমবায়ভিত্তিক চিনি কলগুলোই একমাত্র ২০ শতাংশ চট বস্তা ব্যবহার করে থাকে। বস্ত্রমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চিনির প্যাকেজিং ২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকবে (অর্থাৎ জুট-এর বাৎসরিক ২০১৩-১৪-তে ১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪)। এর পরেও ২০ শতাংশের মধ্যেই তা ঘোরাফেরা করবে। কৃষি মন্ত্রকের প্রস্তাব ছিল চলতি বছরেই ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সামনের বছরে ১০ শতাংশ করে পরের বছরে ঐ সংরক্ষণ পুরোপুরি তুলে নেওয়া হোক। একইভাবে, বস্ত্রমন্ত্রকের প্রস্তাব যে ফি বছর চটের বস্তায় খাদ্য শস্য প্যাকেজিং ৫ শতাংশ হারে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস করতে হবে। মন্ত্রকের যুক্তি, সিন্থেটিক ব্যাগের দাম চটজাত দ্রব্যের থেকে অনেক কম। সরকারকে শেষ পর্যন্ত অধিক দামে তা সংগ্রহ করতে হয়, অর্থনীতিতে যার জন্য প্রবল চাপ পড়ে। তাই, আরও সস্তার বিকল্পের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য প্যাকেজিং করার দিকেই নজর থাকছে। আর বি আই-এর গভর্নর ডাঃ রঙ্গরাজন-এর চেয়ারম্যানশীপের অধীনে চিনি সংক্রান্ত শিল্পের জন্য যে কমিটি হয়েছে, সেখানে চিনিকে চটের ব্যাগে প্যাকেজিং করার থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জোরালো প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের ব্যয় সংক্রান্ত দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপেণ্ডিচার) চলতি বছরেই খাদ্যশস্যে চট বস্তার ব্যবহার ৯০ থেকে ৭০ শতাংশে কমিয়ে আনার এবং আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে তা আরও ধাপে ধাপে হ্রাস করার সুপারিশ করেছে। জাতীয় জুট পলিসির লক্ষ্য অনুযায়ী সমগ্র উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্তানির বর্তমান অনুপাত ৮২ঃ১৮ থেকে ৬৫ঃ৩৫ করার দিকে পরিচালিত করা হচ্ছে।

গত ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে চট মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জানান যে, উন্নত মূল্যযুক্ত (ভ্যালু-অ্যাডেড) দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত বিকাশের ও বৈচিত্র্যকরণের জন্য কোন মনোযোগই দেওয়া হচ্ছে না। এক নির্ভরযোগ্য, সুরক্ষিত বাজার ও নিশ্চিত ফেরত (রিটার্ণ) নিয়মিতভাবে থাকায় বছরের পর বছর ধরে চটশিল্পগুলো অ-সংরক্ষিত স্যাকিং এবং স্যাকিং বহির্ভূত দ্রব্য উৎপাদনের দিকে নজর দিচ্ছে না। স্যাকিং-এর নিশ্চিত আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা চটকলগুলোর আধুনিকীকরণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, বাৎসরিক লেনদেনের (টার্ণওভার) এক যৎসামান্য পরিমাণই নতুন মেশিন কেনার জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। বস্ত্রমন্ত্রী খোলাখুলি বলেছেন যে চটজাত দ্রব্যের ১০০ শতাংশ সংরক্ষণ, সরকারের ওপর আপাদমস্তক নির্ভরতা জুট টেকনলজি মিশনের উদ্দেশ্যকেই বিপদ্‌গামী করবে, আর তাই ধাপে ধাপে সংরক্ষণের শতকরা হার কমিয়ে, স্যাকিং দ্রব্য ও সরকারি অর্ডারের ওপর নির্ভরতা থেকে সরে এসে চটশিল্পকে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে, মূল্যযুক্ত স্যাকিং বহির্ভূত রপ্তানিমুখী দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে। জুট কমিশনারের বক্তব্য হল, কেন্দ্রীয় সরকার চটকলগুলোর ৭৫ শতাংশ স্যাকিং ক্রয় করে থাকে। এবারে রবি শস্যের জন্য ৯টি রাজ্য কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের কাছে চটের বস্তার যে আনুমানিক চাহিদা পেশ করে তা ৪ লক্ষ বেল কম!

জে পি এম আইনকে শিথিল বা তুলে দিয়ে চট শিল্পগুলো নিশ্চিতভাবে বিরাট ধাক্কার মুখে পড়বে। এমনিতেই কাঁচা পাট চাষের জমির পরিমাণ, উৎপাদনের মাত্রা কমছে। আবার এটাও ঠিক যে, ফড়ে-ফাটকা চটমালিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সবরকম সুবিধা-সাহায্য নিয়ে সীমাহীন লুটপাট চালাচ্ছে, শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে সমস্ত ধরণের প্রাপ্য অধিকার থেকে। একসময় তাই বামপন্থীরাই চটশিল্পকে জাতীয়করণের আওয়াজ তোলে। সেই আন্দোলনের চাপে ৬টি চটকল জাতীয়করণ করলেও তা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রায় সবকটি বন্ধ। দু-একটি যাও বা চলছে, কন্ট্রাক্ট প্রথা মারফত। চটশিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য-ভর্তুকি দিতে হবে—যেমনটা সে দিয়ে থাকে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে। পরিবেশ দূষণের বিপজ্জনক পরিমণ্ডলে চটজাত দ্রব্য ব্যবহারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও কঠোর আইন বলবৎ করতেই হবে—কারণ খোলা বাজারে সিন্থেটিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না চটজাত সামগ্রী। অপরদিকে, ফড়ে-ফাটকা মালিকদের সবক শেখানো, মধ্যযুগীয় শ্রম মজুরির ভিত্তিতে পশ্চাদপদ্ শিল্প কাঠামো, নানান দুর্নীতি এবং সমস্ত সরকারি সাহায্যকে হেলায় পকেটে পুরে নেওয়া—এর বিরুদ্ধে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে—দৃঢ়ভাবে বলবৎ করতে হবে আইনের শাসন। এই যুগপৎ পদক্ষেপের মাধ্যমে, চটশিল্পে আরও কঠোর নজরদারি ও তদারকি করেই সমাধান করতে হবে শতাব্দী প্রাচীন সাবেক শ্রম নিবিড় এই শিল্পক্ষেত্রটির সমস্যা।

- অতনু চক্রবর্তী

ফার্গুসনের বর্ণবাদী হত্যা এবং ঐ হত্যাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলা

আমেরিকার কদর্য বর্ণবাদী চেহারাটা আরও একবার প্রকট হয়ে সামনে এল ঃ এক পুলিশ অফিসার ১৮ বছরের এক নিরস্ত্র কালো যুবককে হত্যা করার পর রাষ্ট্র নেমে পড়ল ন্যায়বিচারকে বানচাল এবং ঐ পুলিশ অফিসারকে রক্ষা করতে। গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক 'গ্র্যাণ্ড জুরি' রায় দেয়, পুলিশ অফিসার ড্যারেল উইলসনের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ আনা যাবে না। এই পুলিশ অফিসার মাইকেল ব্রাউনের দেহ ১২টি বুলেটে ঝাঁঝরা করেছিলেন এবং ছেলেটির একমাত্র 'অপরাধ' ছিল এই যে, এমন এক দেশের এক কালো ও নিরস্ত্র মানুষ সে ছিল যেখানে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে এবং সমাজে বর্ণবাদী ঘৃণা অত্যন্ত গভীর। একেবারে শুরু থেকেই পুলিশ অফিসারটিকে বাঁচানোর একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ঘাত করা হয়। অনেক ভাষ্যকার যেমন সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন, আসল ঘটনাটা হল, শুনানির গোটা পর্যায়ে প্রসিকিউটির-এর দপ্তর যেন ড্যারেন উইলসনের বদলে মাইকেল ব্রাউনের বিচারেই উদ্যোগী হয়ে ওঠে। মাইকেল ব্রাউন হত্যার পরপরই এক মার্কিন পুলিশ ১২ বছরের টামির রাইসকে হত্যা করে, ওর অপরাধ ও একটা নকল বন্দুক নিয়ে খেলা করছিল। এর আগে ২০১০-এর গোড়ায় একজন কালো যুবক ট্রেভন মার্টিনকে গুলি করে হত্যা করে, কেননা ছেলেটি একটি মাথাঢাকা সোয়েটসার্ট পড়েছিল যা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। মার্কিন জুরি মার্টিনের হত্যাকারীকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ অফিসার এবং নাগরিকরা যদি মনে করে যে কালো মানুষরা তাদের পক্ষে বিপদজনক তবে সেই মানুষদের হত্যা করার লাইসেন্স যেন তাদের রয়েছে। ফার্গুসনের গ্র্যাণ্ডজুরিদের রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে, আর ফার্গুসনে ঘটেছে ক্রোধের জঙ্গী বিস্ফোরণ।

কালো মানুষদের হত্যা এবং সেগুলোর সমর্থনে যুক্তি হাজির করা মার্কিন ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। মাইকেল ব্রাউন ও টামির রাইসের হত্যা ১৯৫৫ সালে ১৪ বছরের এমেট টিল-এর নৃশংস হত্যার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। এমেট টিলকে অপহরণ করে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়, ওর চোখ উপড়ে নেওয়া হয় এবং গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর ওর দেহ গলায় একটা ফ্যানের সঙ্গে কাঁটাতার জড়িয়ে তালাহাচি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়—এই হিংসার ছবিগুলো আমেরিকার সমাজে গভীর বর্ণবিদ্বেষ ও বর্ণবাদী ঘৃণাকেই সোচ্চারে ঘোষণা করছে। মাইকেল ব্রাউনের ঘটনার মতই টিলের হত্যাকারীরাও শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। সেই ধারা আজও অব্যাহত।

আমেরিকা তার বর্ণবাদী উত্তরাধিকারকে ঝেড়ে ফেলেছে বলে যে কথা বলা হয় তা শূন্যগর্ভ বলেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। ওবামা নিজেই বিক্ষোভকারীদের কঠোর সমালোচনা করায়, মাইকেলের হত্যাকারীর অনুকূলে ঘোষিত জঘন্য রায়কে ন্যায্য বলে মন্তব্য করায় এবং এর সাথে বিক্ষোভকারীদের 'শান্তি' ও 'নৈতিকতার' উপদেশ দেওয়ায় এবং প্রতিবাদকারী জনতার ওপর নিপীড়নকে সমর্থন করায় আমেরিকার প্রথম কালো প্রেসিডেন্টের নির্বাচনকে ঘিরে উল্লাস মিলিয়ে গেছে।

ফার্গুসনের রায় আমাদের ভারতেও বর্ণবাদী হিংসা বেড়ে চলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। পাঞ্জাবে এক তরুণ ছাত্রের নৃশংস হত্যা, সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীর এক মেট্রো স্টেশনে মারমুখী জনতার হাতে তিনজন আফ্রিকান মানুষের হত্যার ঘটনা এবং এর আগে দিল্লীর খিরকিতে আফ্রিকান মহিলাদের ওপর উন্মত্ত জনতার বর্ণবাদী হিংসা—এগুলো ভারতে কালো মানুষদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী বিদ্বেষের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী বৈষম্য ও হিংসা এক ব্যাপকতর সংক্রামক মাত্রা অর্জন করছে।

আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হিংসার সঙ্গে ভারতে চলা জাতপাতবাদী হিংসা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংখ্যালঘুদের একই রূপে চিত্রিত করার ভয়ঙ্কর সাদৃশ্যকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা যেমন কালো মানুষদের হত্যাকারী পুলিশ অফিসার ও নাগরিকদের রক্ষা করে, ভারতেও আদালতগুলো রণবীর সেনা চালিত হিংসাকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত না করে বিচারবিভাগীয় গণহত্যা সংঘটিত করে। বাথে ও বাথানিটোলা গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছে এবং শিখ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালিত গণহত্যারও যারা শিকার, তারা আজও ন্যায়বিচার পায়নি এবং এরই সাথে রাষ্ট্রও অকাট্য প্রমাণকে বানচাল করে দিতে এবং ন্যায়বিচারকে ব্যর্থ করে তুলতে হত্যাকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করছে। ভারতে হত্যা এবং হেফাজতে নির্যাতনের কথা যদি ধরা হয় তবে পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী লাগাতার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেনা বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা

সাতের পাতায় দেখুন

আজকের বিহার ঃ উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ এবং প্রকৃত বাস্তবতা

সমীক্ষা ঃ এক সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ

(সি পি আই (এম এল)-এর বিহার রাজ্য কমিটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালিয়ে যে রিপোর্ট তৈরি করে তার অংশবিশেষের প্রথম কিস্তি গত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল, এবার প্রকাশ করা হল শেষ কিস্তি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিবর্তনের অঙ্গীকার

বিহারের জনগণের বঞ্চনার মাত্রা কতটা ব্যাপক সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। একটু গভীরে দেখলে, মর্যাদাপূর্ণ জীবন এবং বুনিয়াদী প্রয়োজন ও আকাঙ্খাগুলো পূরণের জন্য জনগণের ব্যগ্রতাও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিহারের উন্নয়নের চাবিকাঠি রয়েছে একদিকে জনগণের আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে জনগণের অধিকারের দমন ও বঞ্চনার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে।

সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব প্রতীয়মান—তা সে কৃষি অর্থনীতি, অকৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্তি, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা বা অন্যান্য বুনিয়াদী সুযোগ-সুবিধা, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। যে পরিবারগুলোর মধ্যে সমীক্ষা চালানো হয় বলতে গেলে তার ৯০ শতাংশই ভূমিহীন। এ সত্ত্বেও দশকের পর দশকের ভূমি সংস্কার তাদের স্পর্শই করতে পারেনি। আর আজকের সরকার গরিবদের তাদের সামান্য জমিটুকু থেকেও উচ্ছেদ করতে উদ্যত যে জমিটুকু তারা তাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রের কথা বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, দরিদ্ররাই তাদের সমস্ত শক্তি এবং যে সামান্য সম্পদ তাদের রয়েছে সে সবকিছুই কৃষিকাজে সমর্পিত করতে প্রস্তুত, আর যাদের জীবিকা বা আয়ের বিকল্প পথ রয়েছে তারা ক্রমেই কৃষিকে এড়িয়ে চলছে। বিহারে কৃষি আজ মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে দরিদ্র ও মধ্য কৃষকদের ওপর, তা সে তারা নিজেদের জমিই চাষ করুক অথবা বেঁচে থাকার জন্য উচ্চ হারের খাজনায় কিছু জমি লিজ নিয়ে চাষই করুক। কিন্তু সরকারের কৃষি পথ মানচিত্র বা সহায়তা কর্মসূচী এই অংশগুলোকে বলতে গেলে কোন সাহায্যই করে না। বিহারে কৃষির উন্নতির পূর্বশর্ত অতএব হল আন্তরিক ভূমি ও কৃষি সংস্কার এবং কৃষিতে আরও বড় আকারে সরকারি বিনিয়োগ যেখানে প্রকৃত চাষীকে যথেষ্ট সহায়তা সুনিশ্চিত করা হবে।

কৃষি বিকাশরুদ্ধ অবস্থায় থাকায় অ-কৃষি ক্ষেত্রে কাজের খোঁজ যে ক্রমেই বাড়ছে আমাদের সমীক্ষাতে তা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। পূর্ববর্তী বিহারের খনি এবং বড় শিল্প ক্ষেত্রের অধিকাংশই যেহেতু ঝাড়খণ্ডে চলে গেছে, শিল্প ক্ষেত্রের পক্ষে বিহারের অ-কৃষি ক্ষেত্রের এই কর্মীবাহিনীকে নিয়োজিত করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামীণ মজুরদের একটা ভালো অংশ অবশ্য নির্মাণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়, কিন্তু সেখানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। পরিষেবা ক্ষেত্রে যে কাজ পাওয়া যায় তা অসুরক্ষিত ঠিকা কাজ এবং সেখানে বেতন বা সম্মানদক্ষিণাও অত্যন্ত কম। বাইরের রাজ্যে নতুন নতুন এলাকায় চলে যাওয়ার পরিঘটনা তাই বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতি আমাদের কাছে বিহারের শিল্প উন্নয়নের একটা যথোপযুক্ত নকশাকে পরিকল্পিত করার চ্যালেঞ্জ হাজির করছে, যেখানে বিশেষ জোর থাকবে কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং হস্তশিল্পের ওপর, আর জোর থাকবে সুরক্ষিত কাজের সুযোগ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের যথাযথ স্বীকৃতি ও পারিশ্রমিকের ওপর।

কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প, দক্ষতা এবং লাভজনক স্ব-নিয়োগে যা কিছুর উন্নয়নের কথাই বলা হোক না কেন, তার জন্য বিহারে অনেক বেশি ঋণের অন্তঃপ্রবাহ প্রয়োজন। বিহারে ব্যাঙ্কগুলোর ক্রেডিট-জমার অনুপাত ক্রমেই হ্রাস পেয়ে চলেছে এবং দেশের মধ্যে এখন তা সবচেয়ে নিচে। জীবিকা নির্বিশেষে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সহজে লভ্য পর্যাপ্ত ও সাধ্যায়ত্ত ঋণের দাবি একটা সাধারণ দাবি হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমাদের সমীক্ষায় উন্নয়নের ধরণে ব্যাপক সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য সামনে এসেছে। ভূমিহীন দরিদ্ররা সরকারের কাছ থেকে যে সুবিধা পায় তা প্রতীকী চরিত্রের বেশি কিছু নয়; অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী অংশ সবচেয়ে বেশি সুবিধা কব্জা করে, সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্প ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ওপর তারা কখনও-কখনও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। যেটুকু উন্নয়ন হয় তার সুফলের অনেকটাই আবার কেন্দ্রীভূত থাকে গুটিকয়েক প্রথম সারির জেলায়, আর পশ্চাদপদ জেলাগুলো সবসময়েই পিছিয়ে থাকে। এমনকি রাস্তা ও বিদ্যুতের মত জনকল্যাণমূলক পরিকাঠামো বণ্টনের ক্ষেত্রেও পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলো ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সামাজিক দিক থেকে দুর্বল ও বঞ্চিত অংশগুলোর বসতি এলাকাগুলো রাস্তা এবং বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রেও বঞ্চনার মুখোমুখি হচ্ছে।

আজকের দুনিয়ায় পুঁজির এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও উপাদান হিসাবে জ্ঞান সর্বত্রই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কাজেই, সামাজিক দিক থেকে ঊর্ধ্বমুখী সঞ্চরণশীলতার জন্য শিক্ষাকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বা হাতিয়ার হতে হবে। প্রশ্নাতীতভাবে বিহারের দরিদ্ররা আজ শুধু জমি ও কাজের জন্যই ব্যগ্র নয়, তারা শিক্ষার জন্যও ব্যাপক উৎসুক এবং আমাদের সমীক্ষা দেখিয়েছে যে, শিশুদের স্কুলে ভর্তির অনুপাত যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং তার পিছনে রয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের নাছোড় মনোভাব। এ সত্ত্বেও শিক্ষা সামাজিক বৈষম্যের এক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সরকারি স্কুলে শিক্ষা বড় ধরণের সংকটের মধ্যে এবং যে বেসরকারি স্কুলগুলো নাকি 'উচ্চ মানের' শিক্ষা দিয়ে থাকে তাদের ফী এত বেশি যে সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা প্রতিকূলতার শিকার পরিবারগুলোর শিশুদের সেগুলোর থেকে দূরে থাকতে হয়। বিহার সরকার শুধু রাজ্যে অভিন্ন স্কুল ব্যবস্থার সুপারিশ করা মুচকুন্দ দুবে কমিশনের রিপোর্টকেই খারিজ করেনি, তারা সরকারি স্কুলসমূহে শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটাতে বা রাজ্যে গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলগুলোতে প্রতিকূল পৃষ্ঠভূমি থেকে আসা শিশুদের জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তাকে বলবৎ করতেও শোচনীয় রূপে ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথাটাও সত্যি যে, বিহারের ধারাবাহিক পশ্চাদপদতা এবং গণবঞ্চনার জন্য কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতিও অনেকাংশে দায়ী। আগের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগের ক্ষেত্রে যদি তা সত্য হয়ে থাকে তবে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়নের আজকের যুগে তা আরও বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। বিহারের বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লড়াইটাকে তাই কর্পোরেটপন্থী সাম্রাজ্যবাদী নীতিসমূহ এবং কর্পোরেট লুণ্ঠন থেকে দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদকে রক্ষা করার লড়াইয়ের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধতে হবে।

অর্থনৈতিক নীতি এবং উপাদান ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নির্ধারক ভূমিকা থাকে। বিহারে সামাজিক উৎপীড়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবিচার আজও এক অতিরিক্ত বাস্তবতা এবং এর পিছনে মূল কারণ হল প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক মদত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিজেপির উত্থান এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। জাতপাত ও লিঙ্গগত উৎপীড়ন ছাড়াও সংঘ বাহিনী তার সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের এজেণ্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উঠেপড়ে লেগেছে। বিহারে উন্নয়ন ও জনগণের অধিকারের জন্য লড়াইকে তাই জনগণের ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সংহতি এবং জাতপাতভিত্তিক বৈষম্য ও উৎপীড়নের অবসানের পতাকাকেও ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

এই সামগ্রিক উপলব্ধি এবং বীক্ষাকে সামনে রেখে বিহারের জনগণের অধিকার এবং বিহারে উন্নয়নের জন্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা নিচের এই ১৫ দফা সনদের প্রস্তাব রাখছি।

১। ভূমি ও কৃষি সংস্কার

বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের সুপারিশগুলোর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এইগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে (ক) যুক্তিযুক্তভাবে জমির সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে সিলিং বহির্ভূত এবং বণ্টনযোগ্য অন্যান্য জমি ভূমিহীনদের মধ্যে পুনর্বণ্টিত করতে হবে, (খ) সবাইকে বসতবাড়ির জমি দিতে হবে, (গ) সমস্ত রূপের ভাগচাষের নিবন্ধিকরণ করতে হবে, খাজনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং ভাগচাষীদের সহায়তা দিতে হবে।

২। কৃষির উন্নয়ন

সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ ঘটাতে হবে, জল সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণকে সুনিশ্চিত করতে হবে, যথাসময়ে পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে, কৃষকদের ঋণ সুরক্ষা এবং কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে, লাভজনক দাম এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৩। কৃষিজমির নির্বিচার ও বলপূর্বক অধিগ্রহণ বন্ধ করতে হবে

জমি ব্যবহারের যুক্তিযুক্ত নীতি সুনিশ্চিত করতে হবে, অ-কৃষি উদ্দেশ্যে কৃষিজমির অযৌক্তিক ও নির্বিচার ব্যবহারকে খর্ব করতে হবে, কৃষকদের সম্মতি, যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল কৃষি শ্রমিক এবং অন্যান্য গ্রামীণ অংশের কর্মসংস্থান ছাড়া কৃষি জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না।

৪। সকলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ, জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা

কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, ঋণের নিশ্চয়তা এবং বিপণনের সুবিধা সহ হস্তশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করতে হবে, ঠিকা এবং সাম্মানিকভাতা-ভিত্তিক কর্মীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে, সমস্ত শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে, সমস্ত পেশায় কর্মীবাহিনীর ন্যূনতম মজুরি এবং নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে, বৃদ্ধ/বিধবা/শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং পেনশনকে সুনিশ্চিত করতে হবে, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। সকলের জন্য আশ্রয়ের অধিকার

গ্রাম এবং শহর/নগরগুলোতে বসতি স্থাপনকারী মানুষদের নামে পাট্টা দিতে হবে, বিকল্প ব্যবস্থা না করে উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের নামে মানুষকে উচ্ছেদ করা যাবে না, একটি আবাসন নিশ্চয়তা আইন তৈরি করতে হবে এবং গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত ভূমিহীন মানুষকে ৩ সেন্ট করে বাস্তুজমি দিতে হবে, সমস্ত ভূমিহীন দরিদ্রদের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়-ভিত্তিক ইন্দিরা আবাস সুনিশ্চিত করতে হবে, কমপক্ষে দুটি ঘর, রান্নাঘর, শৌচাগার ও পানীয় জলের সুবিধা সহ ইন্দিরা আবাসের সম্মানযোগ্য মডেলের রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে, সাধারণ জনগণের জন্য সহজে লভ্য ও সাধ্যায়ত্ত গৃহ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। সকলের জন্য খাদ্যের অধিকার

খাদ্য নিরাপত্তা আইনকে সুনিশ্চিত করে তুলে প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণ এবং অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্য ও পুষ্টি এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার পিছু প্রতিমাসে ৫০ কেজি খাদ্যশস্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে, গণবণ্টন ব্যবস্থায় সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৭। সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার

অভিন্ন স্কুল ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারের জন্য মুচকুন্দ দুবে কমিশনের সুপারিশ রূপায়িত করতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১ কিলোমিটারের মধ্যে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৩ কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল স্থাপন করতে হবে, প্রতিটি ব্লকে স্নাতক স্তরের কলেজ এবং প্রতিটি জেলায় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে, সমস্ত শিশুর জন্য অভিন্ন ও ভালো মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে, বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে, ঠিকা ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে, শিক্ষা বহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে, সকলের জন্য সমান সুযোগ, বৃত্তি ও শিক্ষা ঋণকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮। সকলের জন্য স্বাস্থ্যের অধিকার

স্বাস্থ্যের অধিকারকে বুনিয়াদি অধিকার করে তুলতে হবে, সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাস্থ্য স্মার্ট কার্ড দিতে হবে, প্রতিটি গ্রামে বুনিয়াদি চিকিৎসা সহায়তা এবং পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যেগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ হবে, মগজ প্রদাহ, ডেঙ্গি, প্লেগ, ম্যালেরিয়া এবং এই ধরণের অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্লক স্তরে কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে, ব্লক হাসপাতালগুলোতে রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদির পরীক্ষাগার এবং জেলা হাসপাতালগুলোতে উচ্চতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত অত্যবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করতে হবে, বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে হবে।

৯। স্বাস্থ্যকর ও নির্মল পরিবেশ

নির্মল ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের লভ্যতা সুনিশ্চিত করতে হবে, দূষণ ও জলজমাকে রোধ করতে হবে, গ্রাম ও শহরগুলোতে পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলীকরণ সুনিশ্চিত করতে হবে, পরিবেশের

সাতের পাতায় দেখুন

পরিস্থিতির দাবি ঃ কাজের ধারাকে উন্নত করুন

কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বড় ধরণের দক্ষিণমুখী পরিবর্তন ঘটে গেছে। যতদিন যাচ্ছে বিজেপির কর্পোরেটমুখী, সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা ততই প্রকট হচ্ছে। মোদীর 'সুদিনে'র শ্লোগানের আসল চেহারা উন্মোচিত হচ্ছে এবং জনগণের ওপর আক্রমণগুলো নামছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম উর্ধ্বমুখী হয়েই চলেছে। এরই মধ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে গুটিয়ে আনার চক্রান্ত চলছে, 'খাদ্য নিরাপত্তা আইন'কে কাটছাঁট করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। যোজনা কমিশনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৈদেশিক পুঁজির ভারতে আসার জন্য দরজাকে পুরোপুরি অবাধ করা হচ্ছে। কর্পোরেটদের স্বার্থে জমি ও সময়ের পরিবর্তন ঘটাতে সরকার উদ্যোগী। একইসাথে চলছে দেশের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে গৈরিকীকরণ ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানো, সাম্প্রদায়িক আক্রমণগুলোও শুরু হয়েছে।

কর্পোরেটদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে। সংসদে বিরোধী শক্তিগুলো দুর্বল ও এখনও রক্ষণাত্মক অবস্থানে থাকছে। জনগণের ওপর যে আক্রমণগুলো নামছে তার মোকাবিলা বাস্তবে হবে মাঠে-ময়দানে আন্দোলনের মধ্যে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই আন্দোলনে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের জন্য সমগ্র পার্টির কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

২৮ জুলাই সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস এবং জাতপাতের ওপর ভিত্তি করা দলগুলোর বিপরীতে বিজেপি হল ক্যাডারভিত্তিক পার্টি, যারা নিচেরতলায় তৃণমূলস্তরে লাগাতার প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ করে থাকে, গৈরিক মতাদর্শের পক্ষে জনগণকে টেনে আনতে সচেষ্ট থাকে। এর জন্য তাদের রয়েছে অনেক শাখা সংগঠন। বিজেপির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত লড়াইটাও তাই নির্ধারক ভূমিকা নেবে তৃণমূলস্তরেই। এই আহ্বানে এটাও বলা হয়, নির্বাচনী লড়াইয়ের মূল ক্ষেত্রগুলো হল নির্বাচনী বুথ। এখানেই শাসকশ্রেণীর পার্টিগুলো অর্থ ঢেলে বাহুবল চালিয়ে থাকে, সরকারি সংস্কার কর্মসূচীর প্রভাবও এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্রিয়াশীল থাকে। কমিউনিস্টরাও তাই নিচেরতলায় বুথস্তরেই জনগণের সমাবেশ ঘটিয়ে কার্যকরিভাবে বিজেপির মোকাবিলা করতে পারবেন। নিচেরতলায় জনগণকে সমাবেশিত করে সামন্তশক্তি ও স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করছে সি পি আই (এম এল)। ঐতিহ্যের এই ধারাতেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই লড়াইয়ের জন্য আমাদের কার্যকরি হাতিয়ার হল নিচেরতলার পার্টি সংগঠন এবং আরও নির্দিষ্টভাবে বুথস্তরের পার্টি ব্রাঞ্চগুলো। তাই আমাদের পার্টি ব্রাঞ্চগুলোকে বুথভিত্তিক পার্টি ব্রাঞ্চ হিসাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। এটা কোন আনুষ্ঠানিক কাজ নয়, বরং এই কাঠামোগুলোর মাধ্যমেই কমিউনিস্ট কর্মীরা লাগাতারভাবে বুথের অন্তর্গত জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখবেন, তাদের দৈনন্দিন সমস্যার পাশে থাকবেন, প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন, পার্টির রাজনৈতিক প্রচারকে বিস্তার করবেন এবং হয়ে উঠবেন জনগণের নেতা। এভাবেই সম্ভব নিচেরতলায় শাসক পার্টিগুলোকে বিশেষ করে বিজেপিকে সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে প্রতিহত করা। একথা আমাদের জানা আছে শুধু রাজনৈতিক কর্তব্যকর্মকে নির্ধারণ করাটাই সব নয়, এর সঙ্গে দরকার কাজের সঠিক ধারা। বুথস্তরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কাজের ধারাকেও তাই প্রয়োজন অনুযায়ী পাল্টাতে হবে ও উন্নত করতে হবে। বুথস্তরে জনসংযোগ ও অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচীটি নিছকই একদফা অর্থ সংগ্রহের বিষয় নয়, অনেক বুথের ক্ষেত্রে এ হল নতুন ধারার কাজের সূচনা। বুথের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলার যে কাজের ধারা তার সূচনা। এই কাজ আমাদের লাগাতারভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

এখানে কাজের ধারার আরেকটা দিককে উল্লেখ করা দরকার। সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করা ও বিস্তারের যে অভিযান পার্টি শুরু করেছে তা এক নির্দিষ্ট সময়সীমা ভিত্তিক। এই সময়কালের মধ্যেই আমাদের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মসূচী ও শ্রেণী সংগঠনের কর্মসূচীগুলোও চলছে। সমস্ত কমরেডই এই দুটি কাজকে সমন্বয় করার কথা বলে থাকেন। অনেকে সমন্বয় করার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা বলছেন। একটা দিকের কাজ হয় তো, আরেক দিকের কাজ হয় না। কোনটাই যেন ঠিক ভালভাবে হয় না। বাস্তবে অনেকটা তাই ঘটছে। অভিযানের কাজটি শ্লথ গতির হয়ে পড়েছে। এদিকে অভিযানের সময়সীমাও শেষ হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে স্পষ্টতা থাকা দরকার যে এই সময়সীমার মধ্যে এই কাজটি হল কেন্দ্রীয় কাজ। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্পষ্টই বলেছে যে, ''গণসংগঠনগুলোকে অবশ্যই নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে মোদী সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে এবং মূল্যবৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার মতো বড় বড় ইস্যুতে আন্দোলনে নামতে হবে। এছাড়া প্রয়োজন হলে পার্টিও আন্দোলনের আহ্বান জানাবে। কিন্তু পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করা ও পার্টি বিস্তারের **কেন্দ্রীয় কাজকে** মাথায় রেখেই এই ধরণের কর্মসূচীগুলো নিতে হবে।'' এক্ষেত্রে মাও-জে-দং-এর ''পার্টি কমিটিগুলোর কাজের পদ্ধতি'' লেখাটির নিম্নলিখিত অংশটি (তা কিছুটা দীর্ঘ হলেও) স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

— ''পিয়ানো বাজানো'' শিখুন। পিয়ানো বাজাতে দশটি আঙুলই সচল হয়; শুধু কয়েকটি আঙুল চালাবো, অন্যগুলো নয়, এতে কাজ হবে না। কিন্তু যদি দশটি আঙুলই একসঙ্গে চেপে ধরা হয়, তবে কোন সুরেলা আওয়াজ হবে না। ভাল সুরসৃষ্টি করতে গেলে দশটি আঙুলকে ছন্দায়িতভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে চালাতে হবে। একটি পার্টি কমিটিকে তার **কেন্দ্রীয় কর্তব্য** দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরতে হবে এবং একই সময়ে কেন্দ্রীয় কর্তব্যের চারিধারে অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজগুলোকেও করতে হবে। ... আর সব বিষয় বাদ দিয়ে শুধু কয়েকটি সমস্যার প্রতি আমাদের সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলে চলবে না। যেখানেই কোনও সমস্যা রয়েছে তার ওপরই আমাদের আঙুল বসাতে হবে এবং এই পদ্ধতি আমাদের পূর্ণ আয়ত্ব করতে হবে। কেউ কেউ ভালো পিয়ানো বাজান, কেউ খারাপ এবং তাদের সুরসৃষ্টিতে বিরাট পার্থক্য। পার্টি কমিটির সদস্যদের ভালভাবে ''পিয়ানো বাজানো'' শিখতে হবে। —

কাজের এই ধারার সঙ্গে যুক্ত আছে কাজের ধারার আরেকটি দিক, তা হল পার্টি কমিটির দ্বারা চেক-আপ ব্যবস্থা। এটা দুর্বল হচ্ছে। অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন এলাকায় তার নিয়মিত অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। নিয়মিত চেক-আপ ও তার ব্যবস্থাপনা না থাকলে এটা সম্ভব নয়। তাহলে মাও-জে-দং-এর এই শিক্ষাটি কিভাবে অনুশীলিত হবে যে ''যেখানেই কোন সমস্যা রয়েছে তার ওপরই আমাদের আঙুল বসাতে হবে''?

পার্টিকে উজ্জীবিত করা ও বিস্তার ঘটানোর অভিযানটি একটা সময়সীমার পর শেষ হবে। কিছু অগ্রগতি অবশ্যই হবে, আবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু অপূর্ণতাও থাকবে। কিন্তু অভিযানটি বর্তমান কর্তব্য-কর্মগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজের যে নতুন ধারার সূচনা ঘটাবে তা হবে আমাদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য স্থায়ী অগ্রগতি।

- কল্যাণ গোস্বামী

ফার্গুসনের বর্ণবাদী হত্যা ...

পাঁচের পাতার পর

আইন এবং ইউ এ পি এ-র মত কিছু আইনের মধ্যে দিয়ে এই সুরক্ষা এবং অব্যাহতিকে আরও অনুকূল করা হয়। ভারতে অনেক বেশি সংখ্যক ফার্গুসন ঘটে চলে ঃ ইসরৎ জাহানের মত হেফাজতে হত্যাগুলো, বস্তারে আদিবাসীদের গণহত্যা, এ সমস্ত কিছুই এই বলে সমর্থন করা হয় যে, যাদের হত্যা করা হয়েছে রাষ্ট্র তাদের পরিচয়ের ভিত্তিতে বিপদ বলে মনে করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেলে বন্দীদের মধ্যে কালো মানুষের সংখ্যাই অনেক বেশি—ভারতে একই জিনিস দেখা যায় দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে—এবং এর পিছনে সক্রিয় থেকেছে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজ যারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাদের 'অপরাধী' এবং 'সহিংস' বলে ছাপ মেরে দেয়। ভারতে বর্তমানে তফশিলি জাতি/উপজাতি নিপীড়ন নিবর্তন আইন বলে যেটা রয়েছে তা এই ঘটনারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, আমাদের সমাজে দলিতদের নৃশংস অপরাধগুলোতে মিথ্যাভাবে ফাঁসানোর প্রচুর দৃষ্টান্তই রয়েছে যার পরিণতিতে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়।

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'স্বাধীনতা', 'আইনের চোখে সবাই সমান' এবং 'সকলের জন্য সমান সুযোগ'-এর কথা নিয়ে গর্ব করে সেখানে কালো মানুষের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য অব্যাহতভাবে চলছে। ভারতেও দলিতরা যে চরম বৈষম্যের মুখোমুখি হয় তাও সমাজের এক অব্যাহত কুৎসিত বাস্তবতাকে প্রতিপন্ন করে। ভারতে কয়েক দশক আগেই সরকারিভাবে অস্পৃশ্যতার 'বিলোপ' ঘটানো হয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এই দেশে চারজনের মধ্যে অন্তত একজন এখনও অস্পৃশ্যতার অনুশীলনে অবিচল রয়েছে। বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে যে বাগাড়ম্বর চলে তারই সাথে বেমানানভাবে সহাবস্থান করে এই বাস্তবতা যে, অস্পৃশ্যতাকে আজও 'স্বাস্থ্য', 'স্বাস্থ্যবিধি' ও 'সংস্কৃতি'র নামে যুক্তিযুক্ত করে তোলা হয়—আর এক্ষেত্রে এগুলো সবই গভীরে শিকড় গেড়ে থাকা বিদ্বেষ ও ঘৃণার অন্য নাম।

ফার্গুসন আমাদের এই কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, 'হিংসা' পুলিশের হাতে নিরপরাধ কালো যুবকের হত্যার চেয়েও আরও বেশি কিছু। যে বিচারধারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক কালো মানুষকে জেলে পাঠায় ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তার হাতে ন্যায়বিচারের প্রণালীবদ্ধ বঞ্চনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হিংসার এক নগ্ন প্রতীক। ভারতে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতগত হিংসার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়—যেখানে গণহত্যা, সংগঠিত হিংসা ও হেফাজতে হত্যাকাণ্ডগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে বিচার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা সংঘটকদের রক্ষা করে আর দলিত, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অনেক বেশি সংখ্যায় জেলে পোরে ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

সারা পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে জনগণের আন্দোলনগুলো যত পারস্পরিক সংহতি গড়ে তুলবে, প্রণালীবদ্ধ বর্ণবাদী, জাতপাতগত ও সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই ততই এগিয়ে চলবে ও জোরদার হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২ ডিসেম্বর ২০১৪)

আজকের বিহার ...

ছয়ের পাতার পর

সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এজবেস্টস ও অন্যান্য শিল্পগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, সাফাই কর্মীদের সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে এবং তাদের কাজের জন্য যথাযোগ্য বেতন ও মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

১০। মহাজনি সুদ ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে

মহাজনদের কাছে সুদে ধার নেওয়া সমস্ত ঋণকে বাতিল করতে হবে, মহাজনি সুদখোরি ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং যারা ঐ ব্যবসা চালাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, সকলের জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ ও সাধ্যায়ত্ত ঋণ লভ্যতাকে সুনিশ্চিত করতে হবে, পুরনো বি পি এল এবং কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে, ব্যাঙ্কগুলোতে ক্রেডিট-জমার অনুপাতকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে হবে।

১১। সকলের জন্য বিদ্যুৎ

সমস্ত গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে, সমস্ত ভুয়ো বিল বাতিল করতে হবে, সঠিক মিটার বসাতে হবে এবং সঠিক মিটার-রিডিং-এর ভিত্তিতে বিল ব্যবস্থাকে বিধিসম্মত করে তুলতে হবে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের বিনামূল্যে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ দিতে হবে, প্রতিটি গ্রামে ও মহল্লায় ইলেক্ট্রিসিয়ান ও মিটার রিডার নিয়োগ করে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মিটার নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সমস্ত প্রান্তিক ও সংকটগ্রস্ত কৃষকদের চাষবাসের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে।

১২। সমস্ত ঋতুতে চলাচলযোগ্য গ্রামীণ রাস্তা ও পরিবহণ

সমস্ত ঋতুতে চলাচলযোগ্য রাস্তা দিয়ে গ্রামগুলোকে, বিশেষভাবে দরিদ্র মহল্লাগুলোকে সংযুক্ত করতে হবে, সমস্ত গ্রামে সরকারি পরিবহণ প্রসারিত করতে হবে, যথাযথ ভাড়ার ভিত্তিতে কার্যকরী সরকারি পরিবহণকে সম্প্রসারিত করতে হবে, বেসরকারি পরিবহণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

১৩। সম সুযোগ ও মর্যাদা

সমস্ত নারী, মহাদলিত, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য অসহায় অংশের জন্য শিক্ষা, মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হবে, সমস্ত ধরণের বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে, নারী এবং সমস্ত দুর্বল অংশ ও সামাজিকভাবে নিঃসহায় মানুষদের জন্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সম সুযোগ ও সুবিধা সুনিশ্চিত করতে হবে, নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে।

১৪। সকলের জন্য ন্যায়

নারী, মহাদলিত, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য অসহায় অংশের ওপর বেড়ে চলা হিংসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সমস্ত ধরণের বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে, ঐ ধরণের ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার এস পি এবং জেলা শাসকদের দোষী সাব্যস্ত করতে হবে, অসহায় অংশগুলোর বিরুদ্ধে চালিত সমস্ত অপরাধের ঘটনাগুলোর নিবন্ধিকরণ এবং ৬ মাসের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করতে হবে, আদালতগুলোতে চলা ব্যাপক দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

১৫। সমতাপূর্ণ বিকাশ

পশ্চাদপদ ও প্রান্তিক এলাকাগুলোর উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার জন্য নগর-কেন্দ্রীক উন্নয়নের কেন্দ্রীভবনকে বন্ধ করতে হবে, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক, নারী, মেহনতি মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন ও আকাঙ্খা পূরণে প্রয়াসী হতে হবে, গ্রামীণ উন্নয়ন কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর ওপর দালাল ও জমিদারদের কব্জার অবসান ঘটাতে হবে। (সমাপ্ত)

- লিবারেশন, ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে

বদলে যাওয়া গ্রাম দেখতে হবে খোলা চোখে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমবায়ে কলকে পায় না গরিব চাষী

গরিব ও ক্ষেতমজুর পরিবারকে সত্যিকার বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে আনাটা যত সহজ তার থেকে ঢের কঠিন গরিব ও মধ্য কৃষকদের বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট করা। ক্ষুদ্র চাষীদের স্বার্থে প্রচার চালালে কি হবে তারা চায় হাতে গরম ফল। কিন্তু তাদের পাশে পাওয়ার জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া খুবই প্রয়োজন। সমবায় ঋণ দেয়, সেচের জল, সার, বীজ ইত্যাদি জোগায়; বীজ উৎপাদনের প্রকল্প চালায় এমনকি হিমঘর পর্যন্ত পরিচালনা করে। সমবায়ের কর্তাব্যক্তিরা প্রায় ক্ষেত্রেই গরিব-মধ্যকৃষকদের বঞ্চিত করে জোতদার, ধনী চাষী ও ব্যবসাদারদের স্বার্থ সিদ্ধ করে এবং নিজেদেরও পকেট ভর্তি করে। খুব পেয়ারের লোক ঋণ-খেলাপী হলেও নতুন করে ঋণ পায় কিন্তু গরিব চাষীর ঋণ পেতে দুর্ভোগের একশেষ। সার-বীজ প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে যায় কিন্তু দরিদ্র চাষী সহজে সে সব পায় না। ভর্তুকির টাকা কালোবাজারীদের হাতে চলে যায়। বীজ ব্যবসায়ে সমবায়ের যথেচ্ছ লাভ হয় কিন্তু সেই মুনাফা থেকে গ্রামের উন্নয়নের কাজ হয় না; বীজ উৎপাদক চাষীকেও ন্যায্য দাম দেওয়া হয় না। দর-দাম ঠিক করার ক্ষেত্রে সমবায়ের সাধারণ সদস্যদের মতামত গুরুত্ব পায় না। সমবায়ের হিমঘরে কর্মী নিয়োগের সুযোগে রাজনৈতিক দাদাগিরি চলে এবং হিমঘরের ব্যবসাটা চালানো হয় প্রাইভেট স্টোর মালিকদের মত বড় বড় ব্যবসাদারদের স্বার্থে। তার ওপর হিসেবে কারচুপি দেখিয়ে সমবায় চালিত হিমঘরের লাখ লাখ টাকা সমবায় কর্তারা আত্মসাৎ করে নেয়। তারা পিঠ বাঁচানোর জন্য শাসকদলে ভিড়ে পড়ে।

সমবায়গুলোর এইসব দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান চালিয়ে প্রচার গড়ে তুলতে পারলে গরিব ও মধ্য কৃষকদের সমর্থন লাভ এবং তাদের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার পথ অনেকটাই খুলে যেতে পারে।

মহিলা আন্দোলনে যে সব উপাদান উপেক্ষিত থাকে

বাড়ীর পুরুষরা বাইরে কাজে চলে যায়। যা রোজগার হয় তার কিছুটা বাড়ীতে দেয়, কিছুটা অনেকে নেশা-ভাঙের মত বাজে কাজে খরচ করে। কখনও উপার্জনের সবটুকু দিলেও সংসার চলে না। সে ক্ষেত্রে মেয়েদেরই দু পয়সা আয়ের জন্য নানা উপায় খুঁজে বের করতে হয়। সাধের কাজ বা অন্যান্য পরিশ্রমের কাজের ফাঁকে তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার 'স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার প্রকল্প' চালু করেছে। এই প্রকল্প গরিব মহিলাদের মধ্যে অনেকটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাত থেকে দশ জনের গ্রুপ বানিয়ে (কোথাও সংখ্যাটা আর একটু বেশী) খেটে খাওয়া মহিলারা প্রতি মাসে টাকা জমিয়ে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখছেন। ব্যাঙ্ক তাদের কম সুদে ঋণ দিচ্ছে। সময়ে ঋণ শোধ করলে ঋণের ওপর ভর্তুকি পাওয়া যায় এবং নতুন করে বেশী অঙ্কের ঋণ মেলে। কিন্তু যে প্রকল্পের নাম করে (যেমন মুড়ি কারখানা, ছোট চাতাল বানিয়ে ধান কিনে চাল তৈরী, ধূপ তৈরী, মৌমাছি পালন, পশু পালন ইত্যাদি) ঋণ নেওয়া হয় সে সব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না। ঋণের টাকা গ্রুপের মহিলারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। ঋণের এই টাকা মহিলাদের সংসারের ভার লাঘবে অনেকটাই কাজে লাগে। তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও গ্রুপের টাকা জমা দেওয়া বা গ্রুপের মিটিংয়ে মহিলারা ঠিক হাজির হয়ে যান। এ যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মহিলাদের এক নতুন সংগঠিত রূপ। শুধু মিড-ডে-মিল কর্মী বা 'আশা' কর্মীর মধ্যে নয়, এইসব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বহুসংখ্যক মহিলার সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার কাজটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপাদান হতে পারে। এদের সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায় রাজনীতির কথা কিভাবে আসবে সেটা সৃজনের বিষয়, এইসব গোষ্ঠী বা গ্রুপকে নিয়ে যে সব কাজে কারচুপি চলে সেগুলো নিয়ে সরব হলেও নারীদের প্রাথমিক সচেতনতা বাড়ে। কয়েকটা কারচুপি ও সমস্যার কথা উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। (১) লোনের তদ্বিরের নামে দালাল চক্রের প্রতারণা। (২) লোন ঠিকমত পরিশোধ হলেও দালালদের বাধায় পরবর্তী লোন না পাওয়া। (৩) সরকারি ভর্তুকির টাকা না আসায় নতুন লোন প্রদানে ব্যাঙ্কের আপত্তি। (৪) কখনও গোষ্ঠীকে নিজের পকেট থেকে আরও বেশী টাকা দেওয়ার নামে 'গোষ্ঠীর' লোন ব্যবসাদার বা মতলববাজ লোকের হাতিয়ে নেওয়া। (৫) যে সব গ্রুপের কর্মকুশলতা ভাল তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি যা দেওয়া হয় তার একাংশ টাকার বিনিময়ে দালালের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যাওয়া।

মহিলা ও কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা বিষয়গুলোকে যদি উপেক্ষা না করে দুর্নীতিরোধে কিছুটা তৎপরতা দেখান আখেরে তা গণআন্দোলনের তথা সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধিতেই সাহায্য করবে।

নানা অংশে ছড়িয়ে পড়া গ্রামীণ সর্বহারা ঃ একসূত্রে বাঁধতেই হবে

গত কয়েক দশকে গ্রামীণ জীবনে ঘটে চলা পরিবর্তনগুলোর সাপেক্ষে আমাদের চিন্তা ও অনুশীলনের দিকগুলোতে কিছু পুনর্বিন্যাস করা দরকার। আমাদের আরও ভাবতে হবে।

গ্রাম বাংলায় কৃষিক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদ ভালই অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সে কারণে ভূমিহীন কৃষকেরা পরিণত হয়েছে কৃষিমজুর বা গ্রামীণ সর্বহারায়। আর এই গ্রামীণ সর্বহারারা কৃষিকাজের বাইরে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ খুঁজে নিচ্ছে বা খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এইসব কাজের মধ্যে নির্মাণ শ্রমিকের কাজটিতেই যুক্ত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকদের সব থেকে বড় অংশ। যেখানে হিমঘর আছে সেখানে ভাল অংশ চলে যাচ্ছে হিমঘর শ্রমিকের কাজে। এছাড়া সর্বত্রই পরিবহণ শ্রমিক হিসেবে নানা কাজে তারা যুক্ত হচ্ছে। পরিবহণ শ্রমিকের পরিসীমাটা অনেকটাই বিস্তৃত। লরি বা ট্রাক্টরের ড্রাইভার, খালাসি, মাল ওঠানো নামানোর কাজ, রিক্সা-ভ্যান, মোটরভ্যান চালানো ছাড়াও এই সমস্ত যানবাহনের মেরামতি, মোটর গ্যারেজ ও লেদ কারখানায় মেকানিকের কাজে গ্রামীণ মেহনতী যুবকেরা ভাল সংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে।

বদলে যাওয়া গ্রাম সমাজে নির্মাণ ও পরিবহণ—প্রধানত এই দুই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত গ্রামীণ মেহনতীদের কেমনভাবে সংগঠিত করা যায় তার হদিশ আমাদের পেতেই হবে। - **মুকুল কুমার**

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ করার বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্ত বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপন্ন করছে

সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপির একাধিক নেতা-মন্ত্রী যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তার কোনোটি ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে যেমন বিপদগ্রস্ত করেছে, কোনোটি আবার বস্তুবাদী বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করেছে। যেমন কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্লাস্টিক সার্জারির কৃৎকৌশল প্রাচীন ভারতীয়দের অবশ্যই জানা ছিল। আর জানা যে ছিল তার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে তিনি সাক্ষী মানেন পুরাণ কাহিনীকে, যেখানে রয়েছে গণেশের মাথা কাটা যাওয়ার পর সেখানে হাতির মাথা বসানোর প্রসঙ্গ। প্রায় একইরকম হাস্যকর অথচ ভয়ঙ্কর বার্তা এল ভারতের ইতিহাস পঠন-পাঠনে যাকে কর্তাব্যক্তির পদে বসানো হয়েছে সেই দীননাথ বাত্রার এক কীর্তিতে। গুজরাটে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবশ্য পাঠ্য 'তেজোময় ভারত' নামক একটি বই তিনি লিখেছেন। ঐ বইটির ছত্রে ছত্রে বিস্তর মণিমাণিক্য ছড়ানো আছে। সেগুলোর মধ্য দিয়ে শ্রীবাত্রার প্রতিপাদ্য ঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু জ্ঞান এবং উদ্ভাবনই প্রাচীন ভারতে—দুই সহস্রাব্দ বা তার বেশি আগে—জানা ছিল। তিনটি নজির। এক ঋকবেদে 'অনশ্ব রথ'-এর উল্লেখ আছে, এতদ্বারা প্রমাণিত হল যে বৈদিক যুগে ভারতে মোটরগাড়ি ছিল। হক কথা; যে রথ অশ্বে টানে না, মোটরগাড়ি ছাড়া তা আর কী বা হতে পারে? সে গাড়ির কী ব্র্যাণ্ড, কোন মডেল, সে কথা অবশ্য ইতিহাসস্রষ্টা বলেননি, অ্যাম্বাসাডরই হবে মনে হয়। দুই, গান্ধারীর গর্ভজাত মাংসপিণ্ড থেকে দুর্যোধনাদি একশো সন্তানের জন্মের বৃত্তান্ত তো জানি, কিন্তু কখনও ভেবেছি কি যে, এই কাহিনী প্রমাণ করে, দু হাজার বছর আগে ভারতে স্টেম সেল রিসার্চ কোন শিখরে পৌঁছেছিল? তিন, টেলিভিশন আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নয়, মহাভারতের যুগে, না হলে ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরীতে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাবিবরণী শুনলেন কী করে? 'সঞ্জয় উবাচ' মানেই হল গিয়ে লাইভ টেলিকাস্ট।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে প্রধানমন্ত্রী ও 'ইতিহাসবিদ'-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিবর্তন বিজ্ঞানে তার নিজস্ব অবদান রাখতে এগিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তার বয়ান অনুসারে সমস্ত ভারতীয়রাই হল রামজাদা। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় পার্থক্য করেননি। মুসলিম ও খ্রীষ্টানরাও যে রামজাদা তা নিশ্চিত দাবি করেছেন। যারা এটা মানবে না, তাঁর মতে তারা অতি অবশ্যই 'হারামজাদা'।

তবে এইসব জ্ঞানগম্যি বিতরণের থেকেও অনেক বেশি আলোড়ন তৈরি হয়েছে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের তরফে একটি সরকারি সিদ্ধান্তের ভাবনা সামনে নিয়ে আসায়। সুষমা জানিয়েছেন গীতাকে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার কথা হচ্ছে। যেদিন নরেন্দ্র মোদী ওবামাকে গীতা উপহার দিয়েছেন সেদিন থেকেই নাকি প্রকারান্তরে গীতা এই 'মর্যাদা' পেয়ে গেছে, এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটুকু যা বাকী।

'গীতা' নিঃসন্দেহে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে এবং ভারতের বাইরেও দার্শনিক পণ্ডিত মহলে তার সমাদর বিস্তর। গীতার বহু ভাষ্য (কমপক্ষে ২২৭টি তো বটেই, যার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে) লেখা হয়েছে দেশে-বিদেশে, সেকালে এবং একালে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দার্শনিক শঙ্কর যেমন গীতাভাষ্য রচনা করেছিলেন তেমনি একালে গীতার ভাষ্য লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক, শ্রী অরবিন্দ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আচার্য বিনোদা ভাবে, চক্রবর্তী রাজা গোপালচারী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তানায়কেরা। শাহজাহানপুত্র দ্বারাশুকো অন্যান্য অনেক গ্রন্থের সঙ্গে গীতারও অনুবাদ করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে ১৭৫৮ সালেই ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় চার্লস উইলকিন্স অনুদিত গীতা। ইউরোপ আমেরিকার বিদ্বৎজনদের প্রতি গীতার আকর্ষণের সেই শুরু। উইলকিন্সের অনুবাদ পড়ে দুই মার্কিন কবি এমারসন ও থুরো গীতার প্রতি তাদের মুগ্ধতা ব্যক্ত করেছেন। এমারসন বলছেন, 'গীতাই আদিগ্রন্থ', থুরোর মতে, 'গীতার বিশাল বিশ্বদর্শনের পাশে শেক্সপিয়ারকেও কাঁচা লাগে'। প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ দেখার পর অন্যতম বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের গীতা শ্লোক আবৃত্তি করার তথ্যটি তো সর্বজনবিদিত। উইলকিন্সের পরেও গীতার অনেক অনুবাদ হয়েছে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায়। উনিশ শতকের শেষে এডউইন আর্নল্ডের করা অসামান্য ইংরাজী অনুবাদটি এখনও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিন্তাবিনিময়ের একটি মাইল ফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষাতেও গীতা অনুদিত হয়েছে।

হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির বাইরেও ভগবদ্‌গীতা একটি অসামান্য দার্শনিক গ্রন্থ হিসেবে ইতিমধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের চিরন্তন অঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে এর প্রাথমিক সংযোগের বিষয়টিও সমানভাবে সত্য। আর সেকথা মাথায় রেখেই ভারতের মতো বহু ধর্ম সংস্কৃতির দেশে 'গীতা'র মত কোনও একটি গ্রন্থকে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার অর্থ ভিন্ন ধর্মের মানুষকে অবমাননা করা বা শঙ্কিত করে তোলা। বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘু মানুষেরা তাদের অতীত ও সাম্প্রতিক নানা অভিজ্ঞতার নিরীখ থেকে আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোভ বা ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘু মানুষজনকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টার যে সমস্ত খবর আসছে, সেই আবহে সুষমা স্বরাজের জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে গীতাকে মর্যাদা দেওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক বৃদ্ধি করবে। ভারতের বহুত্ববাদী চিন্তা চেতনার ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে 'গীতা'র মতো কোনও একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে যুক্ত গ্রন্থকে জাতীয় গ্রন্থ করার অভিপ্রায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে সরে আসা উচিত।

- **সৌভিক ঘোষাল**

"আজকের দেশব্রতী" দপ্তরে সমস্ত জেলা থেকে নিয়মিত সংবাদ ও প্রতিবেদন পাঠানোর উদ্যোগ বজায় রাখুন। প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে যা পাঠানোর পাঠাতে হবে। —সম্পাদকমণ্ডলী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com